'উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

গাভী পালনে ভাগ্য বদল

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়ঃ-

Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নেঃ-

সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)

প্রধান কার্যালয়ঃ ৭৬/এ, উত্তরপাড়া, সাভার, ঢাকা।

ই-মেইল ঃ info@susbangladesh.org

ওয়েব ঃ www.susbangladesh.org

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

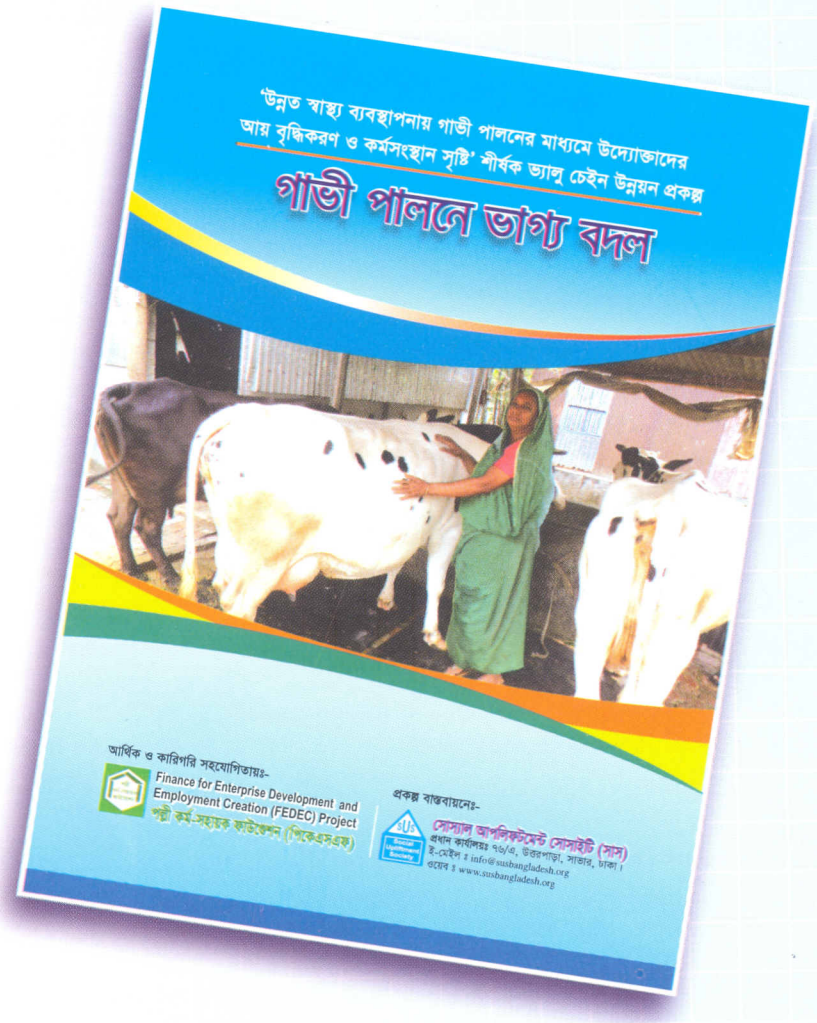

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়ঃ-

Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নেঃ-

সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)

প্রধান কার্যালয়ঃ ৭৬/এ, উত্তরপাড়া, সাভার, ঢাকা।

ই-মেইল ঃ info@susbangladesh.org

ওয়েব ঃ www.susbangladesh.org

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০১৪

উপদেষ্টা ঃ হামিদা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, সাস
মঞ্জুর মোর্শেদ, প্রধান সমন্বয়কারী, সাস

সম্পাদনায় ঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ
মাহমুদা মোরশেদ, উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ
মোঃ মজনু সরকার, সহকারী ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ
ডাঃ সঞ্জয় চন্দ্র ভট্টাচার্য, টেকনিক্যাল অফিসার, সাস

প্রকাশনায় ঃ সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)
৭৬/এ, উত্তরপাড়া, সাভার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৮৮-০২-৭৭৪৬২২৯, ৭৭৪৮২৯৩৩
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-০২২৬৭৩, ০১৭১৫-৩১৫০২৬, ০১৭১১-৮৫৬১২৩
ই-মেইল ঃ sus@citechco.net, info@susbangladesh.org
ওয়েব ঃ www.susbangladesh.org

পরামর্শক ঃ আলতাফ হোসেন

সহায়তায় ঃ অরেঞ্জ বিডি কমিউনিকেশন

ডিজাইন ঃ পার্থ প্রতিম চন্দ

মুদ্রণে ঃ কলেজ গেইট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
ফোনঃ ৯১২২৯৭৯, ০১৭১১৩১১৩৬৬

নির্বাহী পরিচালক
সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)

বাণী

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান বিশাল জনসংখ্যার স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি যোগানের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের বিকল্প নেই। বলা হয়ে থাকে একটি জাতির মেধার বিকাশ নির্ভর করে মূলত ঐ জাতি কতটুকু দুধ পান করে তার উপর। আর তাই দুগ্ধশিল্পকে বিকশিত করতে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নত জাতের গাভী পালন একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের বেকার জনগোষ্ঠী এবং মহিলারা প্রাণিসম্পদ পালনে সম্পৃক্ত হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

সাভার উপজেলার 'ভাকুর্তা এবং তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়ন' মূলত গবাদি পশুপালন সমৃদ্ধ একটি এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পদ্ধতিতে গাভী পালন করলেও অসচেতনতা, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে অনিয়মিত টিকা প্রদান, কৃমিনাশক প্রদান, সঠিকভাবে মৃত প্রাণীর সৎকার না করার কারণে প্রকল্প এলাকায় প্রতিবছর প্রচুর গরু মারা যেত। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অত্র এলাকার প্রকল্পভুক্ত খামারীদের গরুর মৃত্যু হার ছিল প্রায় ১০.০২%। এ অত্যধিক গরুর মৃত্যুহার হ্রাস এবং গাভীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে সহযোগী সংস্থা 'সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)' প্রকল্প এলাকায় "উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পটি সফলভাবে মার্চ, ২০১৩ সালে সমাপ্ত হয়।

বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের আওতায় ৬০০ জন খামারীকে গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষণ, উপকরণ এবং সার্বক্ষনিক কারিগরি, প্রযুক্তি, পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ফলে প্রকল্পে প্রধান লক্ষ্য অনুযায়ী গরুর মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি গাভীর জাত উন্নয়ন সহ গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন বেড়েছে। একই সাথে খামারীদের আয় পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহ, অর্জন এবং প্রভাব মূল্যায়নসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে মূল্যায়নভিত্তিক এ পুস্তিকাটি সংকলিত হয়েছে।

পুস্তিকাটি প্রনয়ণ এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট পিকেএসএফ এর কর্মকর্তা এবং সাস এর কর্মকর্তা সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হামিদা বেগম

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পাতা নং
১	কেস স্টাডি	০১
২	প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	০৩
৩	ভূমিকা	০৪
৪	দুধের পুষ্টিমান	০৫
৫	গাভী পরিচিতি	০৫
৬	গবাদীপশুর খাদ্য পরিচিতি	০৬
৭	উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাসের পরিচিতি	০৬
৮	প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট	০৭
৯	প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী	০৭
১০	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৮
১১	প্রকল্পের কর্ম এলাকা	০৮
১২	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ	১০
১৩	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহ	১৯
১৪	প্রকল্পের প্রভাব	২০
১৫	চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সুপারিশ	৩০
১৬	সংযুক্তি	৩৪

কেস স্টাডি

উন্নত ব্যবস্থাপনায় উন্নত জাতের গাভী পালন করে স্বাবলম্বী বিদেশ ফেরত এক যুবক

সাভার উপজেলাধীন ভার্কুতা ইউনিয়নের অন্তর্গত মেইটক্যা একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামেরই বাসিন্দা মোঃ আবুল হোসেন। এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর ২০০২ সালে অনেকের কাছে ধার দেনা করে স্বচ্ছল জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে মালয়েশিয়া যান তিনি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত স্বচ্ছলতার দেখা তিনি পাননি। ২০০৮ সালের দিকে ব্যর্থ মনোরথে আবুল হোসেন ফেরত আসেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশে এসে অসহায় আবুল হোসেনের সামনে নতুন কিছু করার তাগিদ।

সাভার উপজেলাধীন ভার্কুতা ইউনিয়ন বাংলাদেশের অন্যতম গাভী পালনকারী এলাকা। এ এলাকার প্রতিটি পরিবারই গড়ে ৩-৪টি গাভী পালন করে থাকে। মালয়েশিয়া থেকে ফিরে এসে আবুল হোসেন গাভী পালনের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পুনঃগড়ার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন নিজের দুগ্ধ খামার গড়ে তোলার। শুরু করলেন গাভী পালন। দুইটি গাভী দিয়ে প্রথম শুরু করেন তিনি। আত্মপ্রত্যয়ী আবুল হোসেনের কঠোর পরিশ্রমে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে খামারের আকার, বাড়তে থাকে গরুর সংখ্যা। এভাবে কেটে যায় দুই বছর।

২০১০ সালে আবুল হোসেনের গরুর সংখ্যা ছিল ৫টি তার মধ্যে দুধালো গাভী ছিল ২টি। সবচেয়ে ভালো দুটি গাভী মিলে দিনে ২০-২২ লিটার দুধ দিত। হঠাৎই ছেদ পড়ে আবুল হোসেনের অগ্রযাত্রার। তার ভালো দুধের গাভী ২টি তড়কা রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছু বুঝে উঠার আগেই মারা যায়। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে আবুল হোসেনের মাথায়। তিনি উপজেলা পশু ডাক্তারের কাছে যান এবং তার সাথে কথা বলে জানতে পারেন প্রচলিত পদ্ধতিতে গাভী পালন, নোংরা স্যাঁতস্যাঁতে গোয়ালঘরে গাভী পালন, নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান না করা, যথাযথ পরিচর্যা না করা, গরুর মারা যাওয়ার পর খোলা জায়গায় অথবা নদীতে ফেলে রাখা ইত্যাদি কারণে তার গরুগুলো তড়কা রোগে মারা গিয়েছে। তিনি আরও জানতে পারেন যদি তিনি গরুগুলোকে সময়মত টিকা প্রদান করতেন এবং উন্নত খাদ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন করতেন এবং মৃত গরুর সৎকার সঠিকভাবে করতেন তবে তার গরু মারা যেত না। পাশাপাশি বিষয়গুলো অনুসরণ করলে গরুও মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেত এবং দুধ উৎপাদন ও কাংঙ্খিত পর্যায়ের হতো। তিনি বিষয়টি অনুধাবন করে এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে থাকেন। এর কিছু দিন পর ২০১২ সালের দিকে স্থানীয় সংস্থা সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস), পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় গরুর মৃত্যুহার কমানোর উদ্দেশ্য 'উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ

করে এবং প্রকল্প এলাকার গাভী পালনকারী খামারীদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পদক্ষেপ নেয়। আবুল হোসেন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর তিনি প্রথমে উন্নত ব্যস্থাপনায় গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং গরু মৃত্যু হার হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে বিশদভাবে প্রকল্পের ভেটেরিনারি ডাক্তারের কাছ থেকে কারিগরি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি নিয়মিত প্রকল্পের সাথে জড়িত থেকে প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে থাকেন, নিয়মিত প্রকল্পের ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের পরামর্শ সাপেক্ষে গাভী লালন পালন করতে থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজের জমানো ৭০,০০০ টাকা এবং সংস্থা থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে আবারও দুটি গাভী ক্রয় করেন। ক্রয়কৃত গাভী দুটি এবং পালে থাকা ২টি গাভী মোট ৪টি গাভীসহ পালের সকল গরুকে নিয়মিত টিকা দিতে থাকেন, সুষম খাদ্য প্রদান করতে থাকেন, উন্নত গোয়ালঘর তৈরী করেন, নিয়মিত গোয়ালঘর পরিস্কার করেন এবং গরু অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন। প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতো না অর্থাৎ গাভীকে নিয়মিত টিকা দিত না, গোয়ালঘর নিয়মিত পরিস্কার করতো না, বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে রাখতো, গরু মারা গেলে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখতো, গাভীকে সুষম খাদ্য প্রদান করতো না, গরু অসুস্থ হলে গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতো।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের আলোকে এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সার্বক্ষনিক কারিগরি, প্রযুক্তি, পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণ এবং অনুসরণ করা সহ নিয়মিত সিডিউলভিত্তিক গাভীকে টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান, প্রাণি স্বাস্থ্য কার্ডে নিয়মিত চিকিৎসা, কৃত্রিম প্রজনন এবং উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখার কারণে আবুল হোসেন এর প্রকল্প শুরু থেকে ২০১৪ সালে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোন গরু মারা যায়নি। পাশাপাশি আদর্শ ব্যবস্থা অনুসরণ করার কারণে তার গাভী প্রতি দুধ উৎপাদনও পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বেড়েছে। বর্তমানে আবুল হোসেনের খামারে মোট গরুর সংখ্যা ১০টি যার মধ্যে উন্নত জাতের গাভী সংখ্যা ৪টি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৯,০০,০০০/- টাকার মতো। প্রতিদিন উৎপাদিত দুধের পরিমান ৬০-৭০ লিটার। খাদ্য খরচ বাদ দিয়ে প্রতিদিন দুধ বিক্রি করেই আবুল হোসেন আয় করে ১০০০ টাকার মতো অর্থাৎ গাভী পালন করে আবুল হোসেন এর মাসিক আয় বর্তমানে ৩০,০০০ টাকার মতো। আবুল হোসেন এখন স্বপ্নে বিভোর একদিন তিনি একটি খামার করবেন যেখানে ৪০-৫০টি গাভী থাকবে। অনেক লোক কাজ করবে। একসময়ের বিদেশ ফেরত হতাশ যুবক আবুল হোসেন এখন অনেকের চোখে একজন আদর্শ খামারী।

প্রকল্পের সার সংক্ষেপ

আবুল হোসেনের মত অনেক খামারীই এখন স্বস্তিতে গাভীপালন করছে। এই স্বস্তির ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের যেতে হবে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ভাকুর্তা ও তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের ১৮টি গাভী সমৃদ্ধ গ্রামে যেখানে গাভীর বিশাল কাষ্টার রয়েছে। দুই বছর আগেও কিন্তু এই গ্রামগুলোর চিত্র এরকম ছিলনা। বহুকাল ধরে গাভী পালন করলেও গাভীর উচ্চমৃত্যু হার ছিল বিভীষিকার মত।

ভাকুর্তা ও তেঁতুলঝোড়া এলাকা একটি পুরানো জনপথ। ঢাকা হতে খুবই কাছে হলেও মিরপুর চক এলাকাটিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তুরাগ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে পশু খাদ্যের যোগান থাকায় এ এলাকার মানুষ বংশানুক্রমে গাভী পালনের সাথে জড়িত এবং বেশির ভাগ পরিবারেই একের অধিক গাভী রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পদ্ধতিতে গাভী পালন করলেও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে উদ্যোক্তারা গাভী পালনের ক্ষেত্রে আদর্শ পদ্ধতি, যেমন-সঠিক জাতের বকনা ও গাভী নির্বাচন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, সঠিক কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণ করত না। সুষম খাদ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় খাদ্যের অনেক অপচয় হয় এবং উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি ছিল। এছাড়া গাভীর দুধ বৃদ্ধিতে সহায়ক উন্নত জাতের ঘাস চাষ করত না। সঠিকভাবে টিকা না দেওয়ায় গরুর অধিক মৃত্যু হার এ অঞ্চলে গাভী পালন খাতের বিকাশে একটি বড় অন্তরায়। সচেতনতার অভাব এবং যোগাযোগের দক্ষতা না থাকায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সুবিধাদি গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলনা।

এ প্রেক্ষাপটে গাভী পালন কার্যক্রমকে অধিকতর লাভজনক করার উদ্দেশ্যে খামারীদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন পদ্ধতি, চিকিৎসা সেবা, টিকা, ঔষধ, গরুকে তাজা ঘাস খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা, দুধ বাজার ব্যবস্থা, গরুর জাত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে খামারীদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ সকল সুবিধা বৃদ্ধি করতে উক্ত এলাকায় খামারীদের আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের এর ফেডেক প্রকল্পের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় "উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প" শীর্ষক ১ বছর ৭ মাস মেয়াদী ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি ৩১ মে মার্চ ২০১৪ সালে অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬০০ জন আগ্রহী গাভী পালনকারী খামারীকে গাভীর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সার্বক্ষণিক কারিগরি, প্রযুক্তি, পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে গাভীর দুধ দোহন, গুনাগত মান অক্ষুন্ন রেখে দুধ সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে খামারী ও গোয়ালাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গবাদি প্রাণীর রোগ-বালাই এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট ও পোস্টারর বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা স্বল্পসময়ে প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় মোট ১০ (দশ) জন লাইভষ্টক প্রোভাইডার (এলএসপি) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যেমে তৈরী করা হয়েছে। গরুর রোগ-বালাই পরীক্ষা করার জন্য প্রকল্প এলাকায় ১ (এক) টি মিনি ভেটেরিনারি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীকে গাভীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে খামারীরা গবাদি প্রাণীর রোগবালাই, কৃমিনাশক, ভ্যাকসিনেশন, কৃত্রিম প্রজননের রেকর্ড সংরক্ষণ করছে। এছাড়া খামারীরা মৃত্যু গরু সঠিক উপায়ে সৎকার করছে যার ফলে পরিবেশের ক্ষতিও কমছে এবং রোগ জীবানু ছড়াচ্ছে না। ২৭৮টি টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক প্রদান ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকা এবং কৃমিনাশক প্রদান করা হয়েছে। ফলে গাভীর মৃত্যুহার প্রায় ১০% হতে নেমে ১.০৫% এসেছে। গাভীর মৃত্যুহার হ্রাসের পাশাপাশি গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খামারীদের গড় আয় পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬০.০৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রকল্পভূক্ত খামারীদের আদর্শ পদ্ধতিতে গাভী পালন দেখে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে উন্নত জাতের গাভী পালন ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। আশা করা যায়, প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসাবে ধীরে ধীরে এ সাবসেক্টরে আরো অনেক বেশি বিকশিত হবে।

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের কৃষি অর্থনীতি অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে প্রাণিসম্পদ সেক্টর। ২০১১-১২ অর্থবছরে আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ২.৫ ভাগই আসে প্রাণিসম্পদ থেকে (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৩)। দেশের প্রায় ১ কোটির উপরে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং আরো ৫০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। দেশের ১৬ কোটি মানুষের দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা পূরণে এ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে কৃষি, শিল্প এবং খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আত্মকর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। আমাদের দেশের প্রাণিসম্পদের মধ্যে গাভী পালন অন্যতম এবং বর্তমানে দেশে গরুর সংখ্যা প্রায় ২৩.২০ মিলিয়ন (সূত্রঃ বিবিএস, ২০১২)। আমাদের দেশে পালিত অধিকাংশ গাভী অনুন্নত ও কম উৎপাদনশীল। পূর্বে এদেশের লোকসংখ্যা ছিল কম, চারণভূমি ছিল প্রচুর। তখন সনাতন পদ্ধতিতে দেশী গাভী পালন করে দুধ ও মাংসের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে বর্ধিত জনসংখ্যার আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা মেটানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। সেজন্য দেশী গাভী সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী উদ্ভাবন করা হয়েছে।

কৃষি নির্ভর এই দেশের কৃষিকাজে বিভিন্ন গবাদি প্রাণীর সঙ্গে গাভী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দুধ ও মাংসের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দৈনিক দুধ ও মাংসের চাহিদা যথাক্রমে ২৫০ মিলি ও ১২০ গ্রাম। চাহিদার তুলনায় দৈনিক জন প্রতি দুধ ও মাংসের প্রাপ্ততা যথাক্রমে ৬০-৮০ মিলি ও ৪০ গ্রাম এই ঘাটতি পূরণ সহ মানুষের সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য (দুধ ও মাংস) এর বিকল্প নেই। দুধ ও মাংস আমিষের একটি মূল্যবান উৎস। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ ও রোগী সবার জন্য দুধ পুষ্টিকর খাবার।

আমাদের দেশের দেশী গাভীর উৎপাদনশীলতা কম। আর এ উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার মূল কারণ মূলত পুষ্টির অভাব, রোগ-বালাই, ব্যবস্থাপনিক দুর্বলতা এবং উন্নত জাতের অভাব। তবে গাভীকে সঠিক পুষ্টি প্রদান, উন্নত ব্যবস্থাপনায় লালন পালন এবং চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে দৈহিক ওজন এবং গাভী প্রতি উৎপাদন কয়েকগুন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার পাশপাশি স্থান ভেদে কিছু কিছু জায়গায় গরুর মৃত্যুহার অত্যধিক। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, যথাযথ কারিগরি পরামর্শ, সময়মত চিকিৎসা প্রদান, নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বর্ণিত সমস্যাসমূহ দূর করা গেলে নিঃসন্দেহে এ খাত আমাদের অর্থনীতিতে আরো অনেক বেশি অবদান রাখতে পারবে। ফলে একদিকে যেমন খামারীদের আয় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে এ সাব-সেক্টরে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষিজ ও অকৃষিজ কর্মকাণ্ডে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে সহযোগী সংস্থা সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস), সাভার এর মাধ্যমে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC)-এর প্রকল্পের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় 'উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি সাভার উপজেলার ৬০০ জন গাভীপালনকারী খামারীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন শুরু করে ৩১ মার্চ ২০১৪ সালে সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প থেকে প্রযুক্তি, কারিগরি, চিকিৎসা এবং পরামর্শ সেবা গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন করে প্রকল্পভুক্ত ৬০০ জন খামারীর গরুর মৃত্যু হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন বেড়েছে এবং খামারীদের আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুধের পুষ্টিমান

এক বা একাধিক স্বাস্থ্যবতী গাভী বাচ্চা দেওয়ার ১৫ দিন পূর্বে এবং ৫ দিন পর মোট ২০ দিন ব্যতীত অন্য সময় গাভীর ওলান গ্রন্থির পূর্ণ শারীরিক দোহনে কলস্ট্রামমুক্ত এবং ৩.৫ % ফ্যাট বা চর্বি এবং ৮.৫ % চর্বিবিহীন কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত যে নিংসৃত পদার্থ পাওয়া যায় তাকে দুধ বলা হয়ে থাকে। দুধ মানুষের জন্যে একটি আদর্শ খাদ্য হিসেবে সুপরিচিত। দুধে বিদ্যমান প্রধানত উপাদানগুলো হলোঃ ১) পানি, ২) চর্বি বা ফ্যাট, ৩) প্রোটিন, ৪) ল্যাকটোজ, ৫) খনিজ পদার্থ, এবং ৬) ভিটামিন।

গাভীর দুধের পুষ্টিমানঃ

উপাদান	পরিমাণ
পানি	৮৭.৩%
চর্বি	৩.৭%
ল্যাকটোজ	৪.৫%
খনিজ	০.৭%
আমিষ	৩.৮%

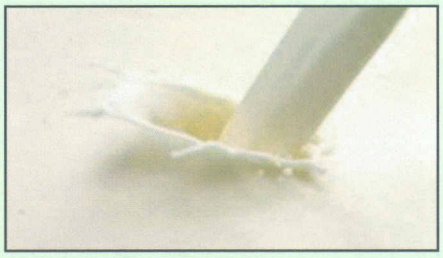

গাভী পরিচিতি

পৃথিবীতে অনেক উন্নত জাতের গাভী রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে গাভীর কোন স্বীকৃত জাত নেই। তবে কিছু কিছু ভালো জাতের দেশী গাভী রয়েছে, যেমনঃ পাবনা জাত, রেড চিটাগং জাত ইত্যাদি। প্রকল্পভুক্ত খামারীরা যে সব ক্রস জাতের গাভী পালন করছে তাদের পরিচিত সংক্ষিপ্তাকারে নিচে দেয়া হলো ঃ

- ফ্রিজিয়ান ক্রস গাভী
- জার্সী ক্রস গাভী

বৈশিষ্ট্য ঃ

- গায়ের রং ছোট বড় কাল সাদা ছাপ যুক্ত।
- মাথা লম্বাটে ও সাদা হয়ে থাকে।
- পিঠে কোন কুঁজ থাকে না।
- গাভীর দেহের ওজন ৭০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।
- গাভী প্রতি দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদন ২০-২৫ লি.।

বৈশিষ্ট্য ঃ

- জার্সি তুলনামূলক ভাবে ছোট আকারের হয়।
- দেহ লম্বা, ভারী নিতম্ব ও পা খাট।
- পিঠে কোন কুঁজ থাকে না।
- এরা বিভিন্ন বর্ণের হয় তবে প্রধানত হালকা লালচে বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে।
- গড়ে প্রতিদিন ১৫-২০ লিটার দুধ দিয়ে থাকে।

গবাদিপশুর খাদ্য পরিচিতি

গবাদি পশুর খাদ্য দুই প্রকার। যথা ঃ ১. আঁশ জাতীয় খাবার ২. দানাদার খাবার

যে সকল খাদ্যে ১৮% এর কম টিডিএন (Total Digestible Nutrient) থাকে, সে সব খাদ্যকে আঁশ জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন ঃ

- ❖ খড়
- ❖ কাঁচা ঘাস
- ❖ লতাপাতা
- ❖ গুল্ম জাতীয় ছোট ছোট উদ্ভিদ ইত্যাদি

যে সকল খাদ্যে ১৮% এর বেশি টিডিএন (Total Digestible Nutrient) থাকে, সে সব খাদ্যকে দানাদার জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন ঃ

- ❖ গমের ভূসি
- ❖ ডালের ভূসি
- ❖ ধানের কুড়া
- ❖ সয়াবিন মিল
- ❖ সরিষার খৈল
- ❖ তিলের খৈল
- ❖ নারিকেলের খৈল
- ❖ গম ভাংগা
- ❖ ভুট্টা ভাংগা ইত্যাদি

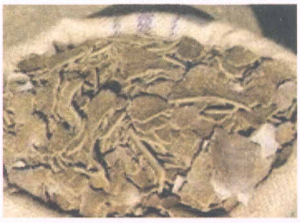

উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাসের পরিচিত

প্রকল্পের আওতায় যে সব উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং (নেপিয়ার) সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রকল্পভুক্ত খামারীদের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তার পরিচিতি, পুষ্টিমান এবং চাষ পদ্ধতি নিচে দেয়া হলোঃ

নেপিয়ার ঘাস ঃ

এটি একটি বহুবর্ষী ঘাস যা একবার লাগালে ৪-৫ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন চৈত্র মাস। জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের যে কোন ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ী ঢাল ও লবণাক্ত জমিতেও এ ঘাস জন্মে।

কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান (প্রতি কেজি ঘাসে)ঃ শুষ্ক পদার্থ ২৫০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ২৫ গ্রাম ও বিপাকীয় শক্তি ২.০ মেগাজুল।

চাষ পদ্ধতিঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরূপে জমি চাষ দিতে হবে। বন্যা পরবর্তীতে কাঁদামাটিতে চাষ ছাড়াই রোপন করা যায়। হেক্টর প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দুরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে. মি. এবং ৩৫ সে. মি.।

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ জমি প্রস্তুতকালে হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি সার দিতে হবে। পরবর্তীতে ঘাস লাগানোর ১ মাস পরঃ হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া এবং প্রতি কাটিং পরবর্তী হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে।

সেচ পদ্ধতিঃ খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর পানি সেচ দিতে হবে।

ঘাস কাটার সময়ঃ গ্রীষ্মকালে ৩০-৪৫ দিন পর পর এবং শীতকালে ৫০-৬০ দিন পর পর (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে) ঘাস কাটা যায়।

কাটিং সংখ্যা/বৎসরঃ ১ম বছর ৬-৮ বার এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ৮-১০ বার ঘাস কাটিং করা যায়।

ঘাস উৎপাদনঃ ১৫০-২০০ টন/হেক্টর/বছর।

প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

আলোচ্য প্রকল্পটি ঢাকা জেলার খুব কাছে অবস্থিত সাভার উপজেলার অন্তরগত ভার্কুতা ও তেতুঁলঝোড়া ইউনিয়নের ১৮টি গাভীসমৃদ্ধ গ্রামে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প এলাকাটি ঢাকা জেলার খুব কাছে অবস্থিত হলেও গাভীপালনে নানারকম অব্যবস্থাপনা, প্রচলিত কুসংস্কার, সংক্রামক রোগ-ব্যাধির প্রকোপ, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব ইত্যাদি নানাবিধ কারনে গবাদি প্রাণির মৃত্যুহার অনেক বেশি ছিল (প্রায় ১০%)। এলাকার গাভী পালনকারী খামারীদের উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গবাদি প্রাণি পালনে কোন রকম প্রশিক্ষণ ছিল না। গবাদি পালনকারী খামারীদের মধ্যে উন্নত ব্যবস্থাপনায় খামার নির্মাণে দক্ষতা ছিল না। গবাদি প্রাণির খাদ্য তৈরীর উপর গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করতো না অনেক খামারী। খামারে রোগ-ব্যাধি হলে সনাতন পদ্ধতিতে কবিরাজের শরনাপন্ন হতেন অনেক খামারী। প্রয়োজনের সময় গুরম্নত্ব না দেয়ার কারনে পরবর্তীতে গবাদি প্রাণি চিকিৎসা সেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো খামারীদের। নিয়মিত সংক্রামক রোগগুলোর বিরুদ্ধে গবাদি প্রাণিকে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। দুগ্ধ খামারীদের অশিক্ষা, অসচেতন মনোভাবের ফলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় সহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল সীমিত। জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন সেবার সীমাবদ্ধতা ছিল অনেক। জাত উন্নয়নে কোন রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা খামারীদের ছিল না। খামারীদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন, চিকিৎসা সেবা, টিকা, ঔষধ, গরুকে তাজা ঘাস খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা, দুধ বাজার ব্যবস্থা, গরুর জাত উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে খামারীদের স্বচ্ছ ধারণা, আদর্শ ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রতিপালন ব্যয় হ্রাস এবং গরম্নর মৃত্যুহার হ্রাস, খামারীদের আয় বৃদ্ধি সহ গাভী পালন কার্যক্রমকে অধিকতর লাভজনক করার জন্যই পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস), সাভার এর মাধ্যমে ০১ বছর ০৭ মাস মেয়াদী 'উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ ০১ বছর ০৭ মাস।
প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর ২০১২-মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত।
প্রকল্পের উপকারভোগীঃ গাভী পালনকারী উদ্যোক্তা।

প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তাঃ ৬০০ জন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ভাকুর্তা ও তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের ১৮টি গ্রাম।
প্রকল্পের মোট বাজেট ঃ ৫১,১৪,৬৮০/- টাকা, (পিকেএসএফ হতে অনুদান ৩৬,২৬,৭২৫/- টাকা (৭১%) এবং অবশিষ্ট ১৪,৮৭,৯৫৫/- (২৯%) (সাস)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্যঃ

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা, আয় বৃদ্ধিকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করাই ছিল প্রকল্পের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্যঃ

ক) কারিগরি, প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গাভীর মৃত্যুহার হ্রাস করা।
খ) উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গাভীর রোগ প্রতিরোধ করা।
গ) খামারীদের উন্নত জাতের গাভী পালন বিষয়ে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।
ঘ) জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারণ করা।
ঙ) গাভীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
চ) গাভী পালনকারী উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ভাকুর্তা ও তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের ১৮টি গ্রাম (মুশুরীখোলা, চাইড়া, কানারচর, চরতুলাতলি, ঝাউচর, মেউটক্যা বাহেরচর, ফিরিঙ্গি কান্দা ও অন্যান্য গাভী সমৃদ্ধ গ্রাম)।

গাভী পালন সাব-সেক্টর ভ্যালু চেইন ম্যাপ

পণ্য ও বিপণন পর্যায়ে ঃ
দুধ দোহনকারী/গোয়ালা/দুধ সংগ্রহকারী তৈরী করা; গাভী ব্যবসায়ী, গাভীর দুধ বিক্রেতা ও প্রক্রিয়াজাতকারী, সরকারী পশুসম্পদ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট গবেষক, পশু খাদ্য বিক্রেতা ও পশু ঔষধ বিক্রেতাদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা;

পণ্য ও বিপণনে বিদ্যমান সমস্যাঃ
স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন ও বাজারজাতকরণ না করা;

প্রযুক্তি ও উৎপাদন পর্যায়ে ঃ
আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন বিষয়ে খামারীদের হাতে-কলমে/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ দোহন করা;
গাভী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পোষ্টার/ফ্লিপ চার্ট খামারীদের প্রদান করা;
গাভীর রোগ-বালাই পরীক্ষা করার জন্য মিনি ভেটেরিনারী ল্যাবরেটরী স্থাপন করা;
টিকা সংরক্ষণ ও গুণগতমানের ঔষধ প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে মিনি ভেটেরিনারী ফার্মেসী স্থাপন করা;
স্থানীয়ভাবে ভেটেরিনারী সেবা সহজলভ্য করতে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) সৃষ্টি করা এবং রোগবালাই প্রতিরোধে কৃমিমুক্তকরণ ও ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা;
গাভীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড (কৃমিনাশক খাওয়ানো, টিকা প্রদান, খাদ্য প্রদান, চিকিৎসা, দুধ উৎপাদন ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য) ব্যবহার করা;

প্রযুক্তি ও উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাসমূহঃ
গাভী নির্বাচন বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা;
খামারীদের আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব;
সুষম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা না থাকা;
বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ে প্রায়শই আক্রান্ত হওয়া;
নিয়মিত কৃমিনাশক না খাওয়ানো ও টিকা প্রদান না করা;
পশু চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির স্বল্পতা ও চিকিৎসা সেবার উচ্চ মূল্য;

উপকরণ পর্যায়ে ঃ
সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমান ঋণ প্রদান করা;
সমিতি ও বিভিন্ন পর্যায়ে মাসিক ইস্যু ভিত্তিক সভা করা;

উপকরণ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাসমূহঃ
সঠিক পরিমান ঋণের প্রাপ্যতা না থাকা;

সম্ভাব্য ইন্টারভেনশন/কার্যক্রম সমূহ

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ

উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও উপকরণ সহায়তা প্রদানসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়। যেমনঃ উদ্যোক্তা নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রদান, আদর্শ গোয়াল ঘর তৈরী, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ দোহনের জন্য দুধ দোহন মেশিন, মিনি ভেটেরিনারী ল্যাবরেটরী স্থাপন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় অতীব করণীয় ও পালনীয় বিষয় সংক্রান্ত পোষ্টার/লিফলেট, ফিপ চার্ট তৈরী ও বিতরণ, গাভী প্রতিপালন সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য সংরক্ষণের জন্যে গাভী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড, মাসিক ইস্যুভিত্তিক সভা, কৃমিমুক্তকরণ ও ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন, বাজার সংযোগ কর্মশালা আয়োজন, উন্নত জাতের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রকল্প এলাকায় ভেটেরিনারী ফার্মেসী স্থাপন, রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। নিম্নে এ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হলঃ

১.০ উদ্যোক্তা নির্বাচনঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬০০ জন (পরিবারের সদস্যসহ মোট ১২০০জন) খামারীকে সার্বিক অবস্থা যাচাইপূর্বক নির্বাচন করা হয়। এ সকল খামারীকে এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে করে এদের মধ্যে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন পদ্ধতি প্রচলন করা হলে অন্যদের মধ্যেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সার্বিকভাবে এ ব্যবসা গাছের উন্নয়ন হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ হল-প্রকল্পভুক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, গাভী পালনের উপর দৃশ্যমান প্রকল্প এবং খামারে কমপক্ষে দুইটি গাভী আছে; গাভী পালন প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী; সুস্থ-সবল, কর্মক্ষম এবং গাভী পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ (নিজস্ব বা ঋণ) বিনিয়োগে সামর্থ আছে এমন উদ্যোক্তা।

২.০ উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনকারী খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিঃ

প্রকল্প এলাকায় ১২০০ জন গাভী পালনকারী খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে আদর্শ ব্যবস্থাপনায় খামার তৈরি, যত্ন ও পরিচর্যা, গবাদি প্রাণিকে সুষম খাদ্য প্রদানের গুরুত্ব, গবাদি প্রাণির সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত টিকা প্রদানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা, গবাদি প্রাণির বিভিন্ন মেটাবলিক রোগ সর্ম্পকে ধারণা প্রদান, গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়মিত কৃমিনাশক সেবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, গাভীর জন্য সঠিক প্রজনন সময় নির্ধারণ, জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব অনুধাবন, গাভীর প্রজনন সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সর্ম্পকে ধারণা প্রদান ও ব্যবস্থাপনা, গাভী পালনে ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ৫০টি ব্যাচে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে সরকারি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছে যা খামারীদের সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৩.০ খামারীদের পুন:প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

প্রকল্পভুক্ত খামারীদের প্রকল্পের শুরুতে গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে কিনা সে উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারীদের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪২০জন খামারীকে পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে খামারীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কারিগরি বিষয় এবং তথ্য পুনঃ উপস্থাপনসহ খামারীদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে করে সকল গাভী পালনকারী প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে পুরোপুরিভাবে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে কাজে লাগাতে পারে।

৪.০ লাইভষ্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের (এলএসপি) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

গবাদি প্রাণির প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্প এলাকার ১০ জন শিক্ষিত তরুণকে ১৫ দিনের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। যারা প্রকল্প এলাকায় সার্বক্ষণিকভাবে গবাদি প্রাণির উন্নত স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক পরামর্শ প্রদান করবেন।

৫.০ দুধ দোহনকারী/গোয়ালা/দুধ সংগ্রহকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ

খাদ্যবাহিত রোগের মধ্যে দুগ্ধবাহিত রোগ (যক্ষা, ব্রসিলোসিস, টায়ফয়েড, সালমোনিলোসিস, তড়কা, টেনিয়াসিস ইত্যাদি) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। দুগ্ধবাহিত রোগের বিস্তার হয় মূলত গাভীর দুধ দোহন প্রক্রিয়া, দগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ উৎপাদন ও বিক্রির জন্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকার ১০ জন দুধ সংগ্রহকারী/গোয়ালা এবং প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিণক্ষপ্রাপ্ত সকল গোয়ালাকে দুগ্ধবাহিত রোগের বিস্তার রোধের জন্যে 'টিট কাপ' নামক একটি উপকরণ প্রদান করা হয়েছে যা বর্তমানে দুধ দোহনের পূর্বে ও পরে গোয়ালারা ব্যবহার করছে।

৬.০ উন্নত জাতের ঘাসের চাষঃ

আমাদের দেশের খামারীরা গাভীকে কাঁচাঘাস দেয়ার জন্যে প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিতে সাড়া বছর সমপরিমানে কাঁচাঘাসের উৎপাদন থাকে না বিশেষ করে শুস্ক মৌসুমে। কিন্তু গাভী থেকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দুধ পাওয়ার জন্যে সারা বছর সমপরিমানে কাঁচা ঘাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে ধান, পাট অনান্য ফসলের মতো মাঠে সারা বছর উৎপাদন হয় এমন প্রজাতির উন্নত জাতের কাঁচা ঘাসে আবাদ করতে হবে। সারা বছরব্যাপী কাঁচা ঘাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে প্রকল্পভুক্ত চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত বেশির ভাগ খামারী নেপিয়ার ঘাসের চাষ করছে।

৭.০ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহঃ

৭.১ খামারীদের স্বাস্থ্যসেবা কার্ড প্রদানঃ

সাভার উপজেলাধীন ভার্কুতা এবং তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নভূক্ত গ্রামগুলোতে খামারীদের মধ্যে গাভী পালন বিষয়ে সচেতনতার অভাব ছিল প্রকট। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি তাদের ধারনার বাইরে ছিল। প্রকল্পভূক্ত গাভী পালনকারী উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গাভী পালন বিষয়ে সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য গাভী পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়াবলী সর্ম্পকে প্রয়োজনীয় সচিত্র ধারনা সংযোজনের পাশাপাশি সারণী আকারে বিভিন্ন তথ্য লিখে রাখার ব্যবস্থা সম্বলিত আধুনিক প্রাণি স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কার্ডে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাণি পরিচিতি তথ্যাবলী

- গবাদি প্রাণিতে কৃমিনাশক সেবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ও সারণী
- গবাদি প্রাণির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের সচিত্র বিবরণ
- রোগের লক্ষণ এবং টিকা প্রদানের সারণী সহ শিডিউল
- গবাদি প্রাণির জন্য সারা বছরব্যাপি প্রজনন ক্যালেন্ডার
- গবাদি প্রাণির চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধকরণের সারণী
- প্রাণী চিকিৎসকের খামার পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করার সারণী
- গবাদি প্রাণি লালন পালনে গুরুত্বপূর্ণ উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত
- নীতিমালা ও করণীয় বিষয়াবলীর তালিকা।
- দানাদার খাদ্যের তালিকা এবং তৈরী পদ্ধতি

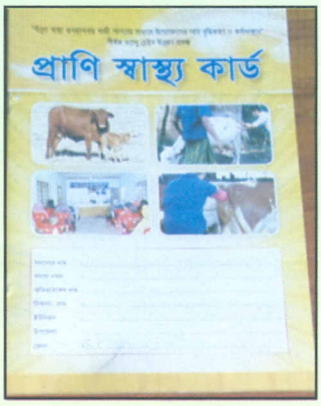

৭.২ মিনি ল্যাব স্থাপনঃ

প্রকল্প এলাকা থেকে ভেটেরিনারী ল্যাব দূরে হওয়ায় খামারীদের গাভী অসুস্থ হলে সহযে প্রাণির মল, মূত্র ও রক্ত পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়না। এর ফলে অনেক সময় খামারীদের গাভী অসুস্থ হয়ে মারা যায়। খামারীরা আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক রোগ-নির্ণয়ের জন্য একটি মিনি ভেটেরিনারী ল্যাব স্থাপন করা হয়। এর ফলে খামারীরা সহজেই এ মিনি ভেটেরিনারী ল্যাব থেকে গবাদি প্রাণির রোগ-নির্ণয়ের সুবিধা ভোগ করতে পারছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে গরুর গোবর এবং মূত্র পরীক্ষা করে পরীক্ষার ফলাফল রিপোর্ট আকারে খামারীদের সরবরাহ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবাও দেয়া হচ্ছে। প্রকল্প অফিসে চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারগণ সরাসরি পরীক্ষা-নীরিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত থেকে রোগ নির্ণয় করে খামারীদের সঠিক পরামর্শ সেবা প্রদান করছে। জটিল পরীক্ষা-নীরিক্ষার ক্ষেত্রে উপজেলা জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

৭.৩ টিকা প্রদান ও কৃমিমুক্তকরণ ক্যাম্প আয়োজনঃ

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন ও গাভীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গাভীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব জরুরী। সুরতি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গাভী পালনে চিকিৎসা খরচ কমায় এবং মৃত্যুহার কমায়। খামারীদের গাভীকে শতভাগ টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে ২৭৮টি টিকা প্রদান ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। এসকল ক্যাম্পের মাধ্যমে তড়কা, বাদলা ও ক্ষুরা রোগের সিডিউল মোতাবেক প্রতিষেধক টিকা দেয়া হয়। এ সকল ক্যাম্প সকল খামারীর জন্যে উম্মুক্ত ছিল যেখানে প্রকল্প বহির্ভূত খামারীরাও তাদের গাভীকে টিকা দিয়েছে। ২৭৮টি ক্যাম্পের মাধ্যমে তড়কা টিকা দেওয়া হয়েছে ৯১৭৬টি, বাদলা ১৪০০টি, ক্ষুরা রোগের ৪৭২৩ টি এবং ৪২২৯টি গাভীকে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে, যা প্রকল্প অফিসে রেজিষ্টারভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল টিকা প্রদান ক্যাম্পে সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার এবং টেকনিক্যাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে সরকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছে। টিকা প্রদানের জন্যে খামারীদের প্রাণী স্বাস্থ্য কার্ডে সিডিউল অনুযায়ী তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ক্যাম্প

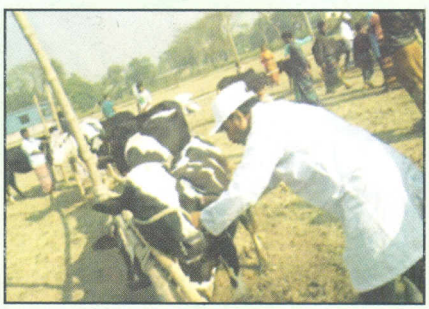

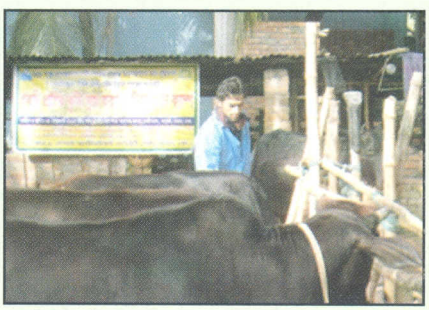

আয়োজনের ফলে একত্রে অধিক সংখ্যক খামারীর কাছে তথ্য দেয়া সম্ভব হচ্ছে যা নিম্নলিখিত সুবিধার ক্ষেত্র তৈরী করেছে-

- খামারীদের গাভীর মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হয়েছে।
- চিকিৎসা খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে।
- খামারীরা নিয়মিত টিকা প্রদানে অভ্যস্থ হয়েছে।
- সরকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে খামারীদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

৭.৪ সার্বক্ষণিক কারিগরি পরামর্শ ও সেবা প্রদানঃ

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান যাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সচেতন হয় তা নিশ্চিত করতে কারিগরি পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। গাভী পালনকারী খামারীদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় খামারস্থাপন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং মোটিভেশন প্রদানের মাধ্যমে গাভীর জন্য উন্নত বাসস্থান তৈরী করার মাধ্যমে অন্যান্য খামারীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরী করা হয়েছে। নিয়মিত ভাবে প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার সহকারী টেকনিক্যাল অফিসারগনের মাধ্যমে গাভী পালন বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায় বিষয়ে তাদেরকে বিভিন্ন তথ্য, পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গাভী পালনকে একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও কারিগরি সেবা যেমনঃ নিয়মিত সংক্রামক রোগগুলোর বিরুদ্ধে টিকা প্রদান, নিয়মিত কৃমিনাশক সেবনের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগিতা যথাযথভাবে প্রদান করেছেন। উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন বিষয়ে খামারীদের প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্পে নিয়োজিত টেকনিক্যাল অফিসার ও সহকারী টেকনিক্যাল অফিসারগণ খামারীদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান যথাযথভাবে প্রয়োগে সচেতনতা সৃষ্টি ও নিশ্চিত করতে প্রত্যেক খামারীর খামারে খামারে গিয়ে সার্বক্ষণিক কারিগরি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করেছে।

৮.০ কৃত্রিম প্রজননে সেবা সম্প্রসারণে গৃহিত পদক্ষেপসমূহঃ

৮.১ কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারনে উদ্বুদ্ধকরণঃ

কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারনের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন করে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দুধ উৎপাদন করার লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং মাসিক ইস্যুভিত্তিক সভার মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। বর্ণিত পদক্ষেপের কারণে কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রকল্পভুক্ত খামারীদের পূর্বের তুলনায় গাভী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

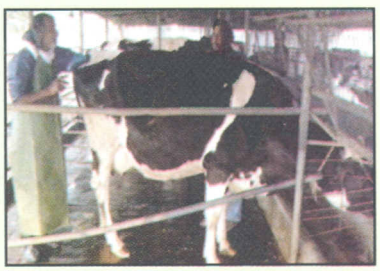

৮.২ স্ট্যাভিস স্থাপনঃ

বেশি উৎপাদনশীল জাতের ষাঁড়ের সীমেন/বীর্য সংগ্রহ এবং তা দূরবর্তী স্থানে পরিবহন করে নিয়ে গাভীকে প্রজনন করানো একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। যেখানে সীমেন পরিবহনের জন্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি কুল চেইন মেইনটেইন করতে হয়। যা এআই কর্মীদের সবসময় মেইনটেইন করা সম্ভব হয় না। এআই করানোসহ যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে গরুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে স্ট্যাভিস এর প্রয়োজন হয় যা প্রকল্প এলাকায় নেই। বর্ণিত সমস্যা দূরকরণের জন্যে প্রকল্পের মিনি ল্যাব সংলগ্ন স্থানে একটি স্ট্যাভিস স্থাপন করা হয়েছে। যেখান থেকে প্রকল্পভুক্ত খামারীরা এআইসহ চিকিৎসা সেবা সেবা নিচ্ছে।

৯.০ উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

৯.১ আদর্শ খামার স্থাপনঃ

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে আদর্শ বাসস্থান একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি গোয়াল ঘরের সকল অনুসঙ্গ, যেমনঃ পাকা চাড়ি, গরু দাঁড়ানোর জায়গা এবং বর্জ্য-নিষ্কাশন ব্যবস্থা আদর্শিক হলে গাভীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। প্রকল্প এলাকার গাভী পালনকারীরা দীর্ঘ দিন ধরে সনাতন পদ্ধতিতে গাভী পালন করত। এজন্য তারা আদর্শ গোয়াল ঘর তৈরীতে প্রথম দিকে আগ্রহী ছিলনা। অপরিকল্পিতভাবে গোয়ালঘরগুলো তৈরী হবার কারণে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভবপর ছিলনা, পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারত না ফলে বিভিন্ন রোগবালাই দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়ে গাভী রোগাক্রান্ত থাকত। বিভিন্ন পরিদর্শনে দেখা গেছে অপরিচ্ছন্ন গোয়াল ঘরের কারণে খামারীর পারিবারিক পরিবেশ নষ্ট হত। প্রকল্পের কারিগরি কর্মকর্তা ও সহকারী কারিগরি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রকল্পের গাভী পালনকারী খামারীদের মাঝে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের ফলে উন্নত বাসস্থান তথা খোলামেলা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাসস্থান নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে কারিগরি ও পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৫টি আর্দশ খামার স্থাপন করা হয়েছে।

৯.২ দুধ দোহনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

প্রকল্প এলাকায় খামারীরা সংকর জাতের গাভী পালনে অভ্যস্ত, যেসব গাভীর দুধ উৎপাদনশীলতা বেশি। এলাকায় গাভী পালনকারীদের সমবায় ভিত্তিক দুধ দোহন, গাভীর ওলান ফুলা রোগ থেকে মুক্তি ও কম সময়ে আধুনিক পদ্ধতিতে দুধ দোহনের বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় একই এলাকার কাছাকছি কয়েকজন সদস্যের মধ্যে একটি দুধ দোহন মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এলাকায় খামারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে দুধ দোহনের জন্য প্রকল্পভূক্ত কয়েকজন খামারীর খামারে দুধ দোহন মেশিন স্থাপন করা হয়।

১০.০ প্রকল্পের আওতায় গৃহিত সচেতনমূলক কর্মকাণ্ডসমূহঃ

১০.১ খামারীদের মাঝে লিফলেট ও পোষ্টার বিতরণঃ

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন বিষয়ে এলাকাবাসী এবং প্রকল্পভূক্ত খামারীদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে এ বিষয়ে তথ্য ও নির্দেশাবলী প্রচার করতে প্রকল্পের আওতায় ৮,০০০ লিফলেট ও পোষ্টার তৈরী ও বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল প্রচারের মাধ্যমে প্রকল্পের নির্বাচিত খামারীদের ন্যায় অন্যান্য খামারীরাও উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে আগ্রহী হচ্ছে।

১০.২ বিলবোর্ড স্থাপনঃ

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন বিষয়ে প্রকল্পভূক্ত খামারী এবং এলাকাবাসীকে সচেতন করার প্রয়াস হিসেবে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ন স্থানে একাধিক বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে যা অত্র এলাকার খামারীদের গাভী পালনে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১০.৩ মাসিক ইস্যুভিত্তিক সভাঃ

১২০০ জন গাভী পালনকারী খামারীদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ৫০টি দল গঠন করা (প্রতি দলে ২৪ জন করে সদস্য) হয়। প্রতি দলের প্রত্যেক সদস্যদের নিয়ে মাসে একবার ইস্যুভিত্তিক সভা করা হয়। ইস্যুভিত্তিক সভার মাধ্যমে গাভী পালনকারী খামারীরা তাদের সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে

পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ পায় এবং তাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে গৃহতব্য বিষয়ে সচেতন করা যায়। ইস্যুভিত্তিক সভার মাধ্যমে গবাদি প্রাণির উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়।

১০.৪ বাজার সংযোগ কর্মশালা আয়োজনঃ

প্রকল্পভুক্ত খামারীদের গাভী পালন, স্বাস্থ্যসম্মত দুধ উৎপাদন, উৎপাদিত দুধ সহজে এবং উপযুক্ত মূল্যে বাজারজাতকরণ, চিকিৎসা সেবা খামারীদের দোরগোড়ে সময়মত পৌঁছে দেয়া সহ গাভী পালনের সাথে জড়িত অন্যান্য সেবা সহজে প্রাপ্তির লক্ষ্যে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান/ব্যাক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুধ উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, সরকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পশুখাদ্য বিক্রেতা ও পশু ঔষধ বিক্রেতা, দুধ প্রক্রিয়াজাতকারী এবং দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদনকারীদের সহ এ কাজের সাথে জড়িত সকল ধরনের স্টোকহোল্ডারদের নিয়ে একাধিক বাজার সংযোগ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের সাথে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, দুধ ব্যবসায়ী, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী, পশুখাদ্য উৎপাদনকারী ও পশু ঔষধ উৎপাদনকারী কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সাথে একটি শক্তিশালী লিংকেজ গড়ে উঠেছে।

১০.৫ মিডিয়া তথ্যঃ

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একাধিক প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকল্পটির বিভিন্ন সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয়। দেশের জনপ্রিয় বাংলাভিশন এবং গাজী টেলিভিশন চ্যানেলে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে একাধিক বার ডকুমেন্টারি প্রচারিত হয়েছে। এছাড়াও একাধিক দৈনিক জাতীয় এবং জেলা ভিত্তিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে যা প্রকল্প এলাকার খামারীদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

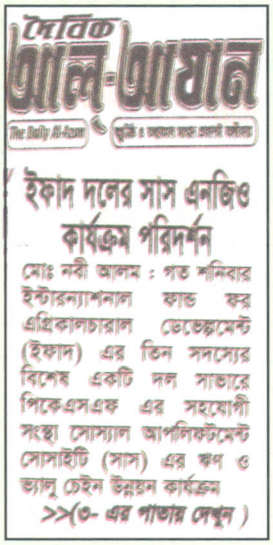

দৈনিক আল-আযান
The Daily Al-Azan

ইফাদ দলের সাস এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শন

মোঃ নবী আলম : গত শনিবার ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) এর তিন সদস্যের বিশেষ একটি দল সাভারে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস) এর ঋণ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম

>>(৩- এর পাতায় দেখুন)

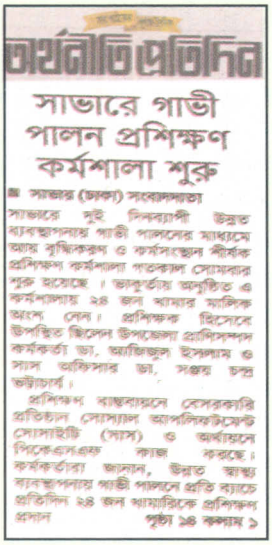

অর্থনীতি প্রতিদিন

সাভারে গাভী পালন প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু

সাভার (ঢাকা) সংবাদদাতা

সাভারে দুই দিনব্যাপী উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা গতকাল সোমবার শুরু হয়েছে। ভাকুর্তায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ২৪ জন খামার মালিক অংশ নেন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আজিজুল ইসলাম ও সাস অফিসার ডা. সঞ্জয় চন্দ্র ভট্টাচার্য।

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস) ও অর্থায়নে পিকেএসএফ কাজ করছে। কর্মকর্তারা জানান, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে প্রতি ব্যাচে প্রতিদিন ২৪ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান

পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

দৈনিক সরেজমিন বার্তা

সাভারে লাইভস্টক সার্ভিস প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান

সাপ্তাহিক আবাবিল
THE WEEKLY ABABIL

ইফাদ দলের সাস এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শন

তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণঃ

প্রকল্প শুরুতে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্যে একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে। যা ব্যবহার করে প্রকল্পভূক্ত খামারীদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রাক মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। একই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে প্রকল্প শেষে সকল খামারীদের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট বিশ্লেষন পূর্বক প্রকল্পের প্রভাব নিরূপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহ

আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্যে পিকেএসএফ হতে প্রকল্পের জন্যে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৬,২৬,৭২৫/- (ছত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকা। প্রকল্প শেষে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৬,২৪,৯৫৫/- (ছত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৯৫%।

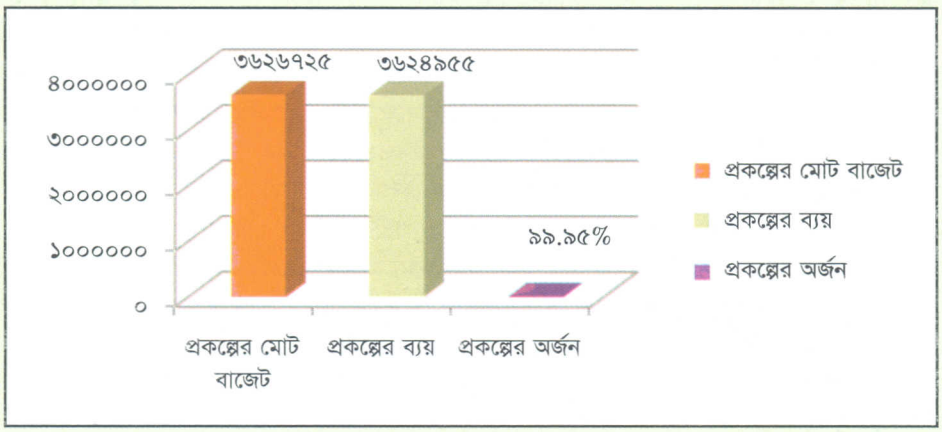

কর্মকাণ্ড ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সফলভাবে ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সকল কর্মকাণ্ড সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের গাভীর সংখ্যা ও দুধ উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ সহ সকল ধরনের কারিগরি, প্রযুক্তি এবং পরামর্শ সেবা নিয়ে গাভী পালনের সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দুর করে সফলভাবে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দেশী গাভীর পাশাপাশি উন্নতজাতের গাভী পালন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিচে দেয়া হলঃ

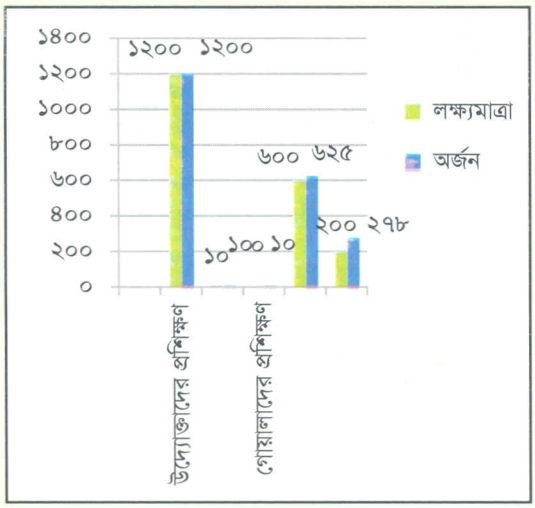

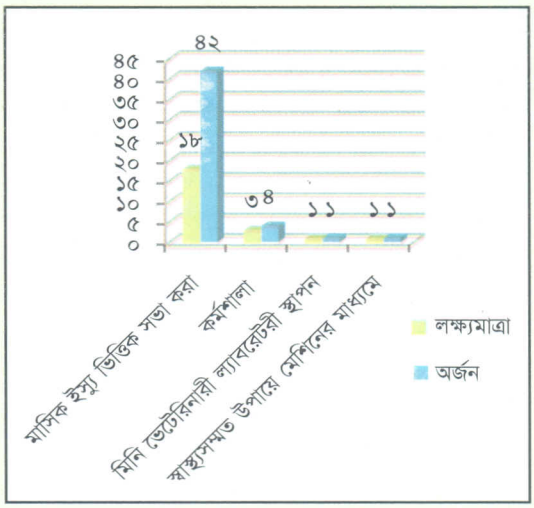

প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গাভীর মৃত্যুহার হ্রাস, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনসহ গাভী পালনের আনান্য ব্যবস্থাপনিক পরিবর্তন, উৎপাদন বিষয়ক এবং খামারীদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে সর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার উপর ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উন্নত ব্যবস্থাপনায় পালনে খামারীদের অভ্যস্থ করে গাভীর মৃত্যুহার হ্রাস সহ দুধ উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দ্যেশে প্রকল্প থেকে নানাবিদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন: খামারীদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; খামারীদের মাঝে লিফলেট ও পোষ্টারের বিতরণের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ-বালাই এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামারীদের জানানো, বাজার সংযোগ কর্মশালার মাধ্যমে ব্যবসায়ী এবং স্টোকহোল্ডারদের সাথে খামারীদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন; উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহের মাধ্যমে খামারীদের উন্নতজাতের কাঁচা ঘাস উৎপাদনে অভ্যস্থ করা; গণ ভ্যাকসিনেশন ও কৃমিমুক্তকরণ ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে গবাদিপশু বিভিন্ন প্রকার রোগের হাত রক্ষা করা; প্রকল্প এলাকায় মিনি ভেটেরিনারী ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে গবাদি পশুর গোবর-মূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সার্বক্ষনিক কারিগরি, প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যে প্রকল্প এলাকায় একজন ভেটেরিনারী ডাক্তারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এসকল কর্মকাণ্ড গ্রহণ এবং সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের গাভীর মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে, দুধ উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোপরি খামারীদের আয় পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ফলে গরুর মৃত্যুহার হ্রাসে, গাভী পালন ব্যবস্থাপনায়, উৎপাদনগত এবং আর্থিক যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

গাভীর মৃত্যুহার হ্রাস

গাভীকে টিকা প্রদানঃ লাভজনকভাবে গাভী পালনের পূর্বশত গাভীর রোগ বালাই দমন এবং গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন বাড়ানো। যা উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা এবং বাজার ব্যবস্থাপনা উপর নির্ভরশীল। গাভীকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের পাশাপাশি রোগমুক্ত রাখতে হবে। গাভীকে রোগমুক্ত রাখার পূর্বশর্ত গাভীকে নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন এবং কৃমিনাশক প্রদান করা। প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ খামারী গাভীকে নিয়মতি টিকা প্রদান করে না। ফলে প্রতি বছর প্রকল্প এলাকায় প্রচুর গরু নানাবিধ সংক্রামক রোগ যেমন: তড়কা, বাদলা, গলাফোলা, ক্ষুরা রোগে মারা যায়। বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় ২৭৮টি টিকা প্রদান ক্যাম্পের আয়োজন করে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীর গরুকে উপরে বর্ণিত রোগের সিডিউলভিত্তিক টিকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে খামারীরা নিজস্ব উদ্যোগে এসব রোগের টিকা ক্রয় করে গাভীকে নিয়মিত টিকা প্রদান করছে।

চিত্র: গাভীকে টিকা দেয়া হচ্ছে

তড়কা রোগে টিকা প্রদানঃ প্রকল্পের সমাপনী সার্ভে থেকে দেখা যায়, প্রকল্পের শুরুতে মাত্র ১১৭ জন খামারী তাদের গবাদি প্রাণিদের তড়কা রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদান করতো, ১৯৩ জন খামারী অনিয়মিতভাবে এবং ৩৮০ জন খামারী তড়কা রোগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতো না। প্রকল্পের সমাপনী প্রতিবেদন থেকে

দেখা যায় ৬০০ জন খামারীর মধ্যে ৫৯৭ জন খামারী অর্থাৎ ৯৯% খামারী তড়কা রোগের বিরুদ্ধে তাদের গবাদি প্রাণিকে টিকা প্রদান করেছেন অর্থাৎ টিকা প্রদানের হার শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে (বিস্তারিত টেবিল-১)।

টেবিল-১ঃ তড়কা রোগে টিকা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	তড়কা		
	নিয়মিত	অনিয়মিত	না
প্রাক-মূল্যায়ন	১১৭	১৯৩	৩৮০
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৫৯৭	৩	০

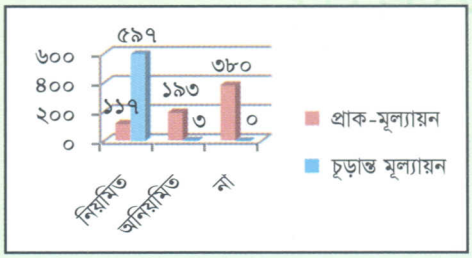

ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদানঃ প্রকল্প এলাকায় ক্ষুরা রোগ গবাদি প্রাণির উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বিশাল ঝুঁকি তৈরী করেছিল। প্রকল্প এলাকার দু'প্রান্তে গবাদি প্রাণি বেচা-বিক্রির হাট থাকায় প্রতিবছর অনেক গবাদি প্রাণি ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত হয়ে যেত। উল্লেখ্য যে, ক্ষুরা রোগ একটি ভাইরাস জনিত রোগ এবং এ রোগের বাহক ভাইরাস পানির মাধ্যমে ৩০০ মাইল এবং বাতাসের মাধ্যমে ৬০ মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত বাছুরের বেলায় মৃত্যুর হার শতকরা ৯৫ ভাগ। এছাড়া এ রোগে আক্রান্ত গাভীর দুধ উৎপাদন মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হয় এবং ষাড় গরুর ক্ষেত্রে মাংস উৎপাদন কমে যায়। প্রকল্প এলাকায় ক্ষুরা রোগের ব্যাপক প্রভাব ছিল। প্রাক মূল্যায়ন জরীপে দেখা যায়, ৬০০ জন খামারীর মধ্যে মাত্র ১৭৫ জন খামারী নিয়মিতভাবে গবাদি প্রাণিতে ক্ষুরারোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদান করতেন, অনিয়মিত টিকা প্রদান করতেন ১৫৮ জন এবং টিকাপ্রদান করতেন না ২৬৭ জন। প্রকল্পের টিকাপ্রদান ও ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আওতায় দেখা গেছে, বর্তমানে ৫৯৪ জন খামারী (শতকরা ৯৯%) গবাদি প্রাণিতে প্রকল্পের কারিগরি কর্মকর্তাদের সাহায্যে ক্ষুরা রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদান করছে। এতে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় গবাদি প্রাণিতে ক্ষুরা রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদান হার পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬৯% বৃদ্ধি পেয়েছে (টেবিল-২ এ)।

টেবিল-২ঃ ক্ষুরারোগে টিকা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

ক্ষুরা রোগ	নিয়মিত	অনিয়মিত	না	বৃদ্ধি (%)
প্রাকমূল্যায়ণ	১৭৫	১৫৮	২৬৭	৬৯%
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৫৯৪	৩	৩	

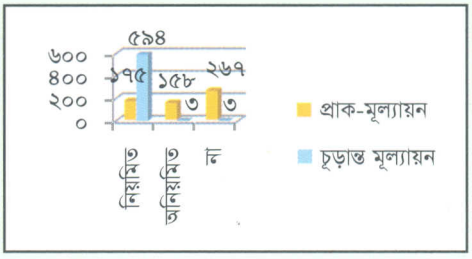

বাদলা রোগে টিকা প্রদানঃ তড়কা এবং ক্ষুরা রোগের মত বাদলা রোগ ও গবাদি প্রাণির একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত অতি তীব্র সংক্রামক রোগ। গো-খামারের ১-৩ বছর বয়সী সুন্দর গবাদি প্রাণিগুলো প্রধানত এ রোগের সবচেয়ে বেশী শিকার হয়। এ রোগে গবাদি প্রাণির মাংস পঁচে যায় এবং প্রথম দিকে ধরা না পড়লে গবাদি প্রাণির বাচ্চা বাঁচানো সম্ভব হয়না। প্রকল্প এলাকার গাভী পালনকারী খামারীরা এ রোগটার ব্যাপারে খুব উদাসীন ছিলেন। সরকারি অফিস থেকে অনিয়মিত ভাবে এ রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদান করা হত। এতে গবাদি প্রাণিতে প্রদাহের হার সামান্য কমত। কিন্তু এ রোগে কোন গবাদি প্রাণি মারা গেলে সে প্রাণির চামড়া হয় কসাই নিয়ে যেত নতুবা

মৃত্যু প্রাণিকে হয় খোলা জায়গায় অথবা পানিতে ফেলে দিত। এই মৃত্যু প্রাণি থেকে পুনরায় সংক্রমন ছড়িয়ে পড়ত। প্রাথমিক জরিপ তথ্যে দেখা যায় ৬ জন খামারী নিয়মিত ভাবে তাদের খামারে এ রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদান করতেন। ৫৮৩ জন খামারী তাদের গবাদি প্রাণিগুলোকে টিকা প্রদান করতেন না। এই এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর থেকে এ পর্যন্ত ৫৮০ জন খামারী প্রকল্প সহায়তায় তাদের গবাদি প্রাণিগুলোকে বাদলা রোগের টিকা প্রদান করেছেন অর্থাৎ ৯৭ শতাংশ খামারীরা এ ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন। এ চিত্র নিচে তুলে ধরা হল। প্রকল্পভূক্ত খামারীরা এখন আর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মৃত গবাদি প্রাণিকে খোলা জায়গায় ফেলে দেয় না অথবা কসাইয়ের কাছেও মৃত বাছুর দিয়ে দেয় না (বিস্তারিত-৩ তে)।

টেবিল-৩ঃ বাদলারোগে টিকা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	বাদলা		
	নিয়মিত	অনিয়মিত	না
প্রাক-মূল্যায়ন	৬	১১	৫৮৩
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৫৮০	১৭	৩

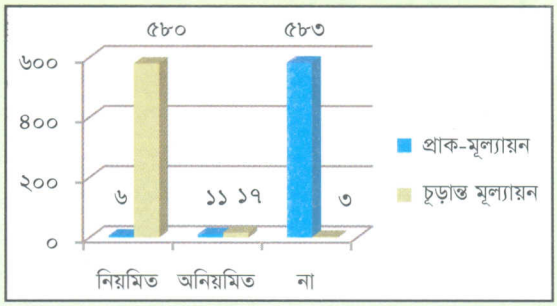

গাভীকে কৃমিমুক্তকরণঃ বাংলাদেশে অধিকাংশ গবাদিপশু পুষ্টিহীনতায় ভুগে থাকে। এর প্রধান কারণ পরজীবীর প্রার্দূভাব বেশি। বেশির ভাগ গবাদিপশু অধিকাংশ সময় কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। কৃমি আক্রান্ত গরু যত খাবার দেয়া হয় খাবারের একটি বড় অংশ কৃমি খেয়ে ফেলে ফলে প্রাণী পুষ্টিহীনতায় ভুগে থাকে। এ সকল প্রাণী স্বাভাবিক ক্ষমতার চেয়ে কম দুধ উৎপাদন করে থাকে। অধিকাংশ খামারীকে গাভীকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়ায় না। বর্ণিত বিবেচনায় প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ১০০টি কৃমিনাশক ক্যাম্প আয়োজন করে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীর গরুকে কৃমিনাশক খাওয়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে নিয়মিত গাভীকে কৃমিনাশক প্রদানকারী খামারীর সংখ্যা ছিল ৩৫৬ জন যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫১ জন। প্রকল্পের ৬০০জন খামারী ছাড়াও প্রকল্পের প্রভাবে প্রকল্প বহির্ভূত ২৯০ জন গাভী পালনকারী কৃশিনাশক তাদের গরুকে কৃমিনাশক সেবন করিয়েছেন। চূড়ান্ত মূল্যায়নে দেখা যায়, গোবর পরীক্ষার মাধ্যমে ৬০০ জন খামারীর মধ্যে গবাদি প্রাণিকে কৃমিনাশক প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়ান ৫৫১ জন খামারী (৯১.৮৩%) এবং অনিয়মিত ভাবে কৃমিনাশক খাওয়ান ৪৯ জন খামারী (৮.১৭%)। ফলে প্রকল্প এলাকায় গাভীর কৃমি আক্রান্ত হওয়ার প্রার্দূভাব কমেছে যা চিকিৎসা খাতে ব্যয় কমাতে এবং দুধ উৎপাদন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে (বিস্তারিত-৪ তে)।

চিত্রঃ গাভীকে কৃমিনাশক খাওয়ানো হচ্ছে

টেবিল-৪ঃ গাভীকে কৃমিনাশক প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	গাভীকে নিয়মিত কৃমিনাশক প্রদানকারী (জন)	গাভীকে অনিয়মিত কৃমিনাশক প্রদানকারী (জন)	কৃমিনাশক প্রদান করতো না (জন)
প্রাক-মূল্যায়নে	৩৫৬	১৯৮	৪৬
চুড়ান্ত মূল্যায়নে	৫৫১	৪৯	-

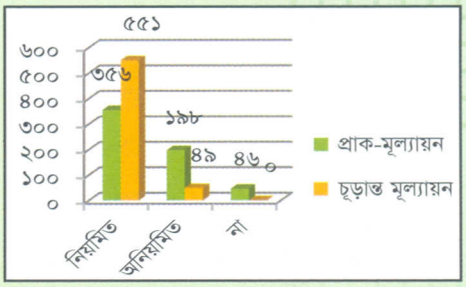

বিভিন্ন সেবা কেন্দ্র হতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণঃ গাভীকে নিয়মিত টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক খাওয়ানোর পাশাপাশি ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে খামারীদের যথেষ্ট সচেতনতা বেড়েছে, যেমন: বর্তমানে গাভীর চিকিৎসার দরকার হলে বেশির ভাগ খামারী সরকারি বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন নিকট থেকে নিচ্ছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অনেক কম ছিল। প্রকল্পের সমাপনী মূল্যায়নে দেখা গেছে, গবাদি প্রাণি পালনকারীদের মধ্যে সরকারি প্রাণি হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা নেয় ১২৮ জন খামারী, গ্রাম্য পল্লী চিকিৎসক থেকে চিকিৎসা নেয় ৪৭০ জন এবং কবিরাজ এর মাধ্যমে চিকিৎসা নেয় ২ জন খামারী, প্রকল্প শেষে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বর্তমানে ৬০০ জন খামারীর মধ্যে ৪৮০ জন খামারী সরকারী বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন, ১০৮ জন স্থানীয় প্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক এবং ১২ জন ঔষধ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পরার্মশ এবং সেবা গ্রহণ করছে এবং অপ্রশিতি পল্লী চিকিৎসক বা গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে কেউ চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে না যা গবাদি প্রাণীর রোগবালাই আক্রান্ত হওয়া এবং মৃত্যুহার কমিয়ে দিয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ (টেবিল-৫)।

টেবিল-৫ঃ চিকিৎসা ও পরার্মশ সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

চিকিৎসা ও পরার্মশ সেবা গ্রহণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে
সরকারী বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন নিকট থেকে	১২৮ জন	৪৮০ জন
স্থানীয় প্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক থেকে	৬০জন	১০৮জন
অপ্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক থেকে	৪৭০ জন	-
গ্রাম্য কবিরাজের কাছ থেকে	০২ জন	-
ঔষধ ব্যবসায়ী থেকে	-	১২ জন

মৃত্যু গরুর অপসারণে গৃহীত পদক্ষেপঃ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে গবাদি প্রাণি পালনকারী খামারীরা গবাদি প্রাণি মারা গেলে তাদের সৎকার কার্যক্রমে এতটা মনোযোগী ছিল না। গবাদি প্রাণি মারা গেলে তারা সেসব প্রাণিকে নদীর জলে কিংবা খোলা জায়গায় ফেলে রাখতো। অনেকসময় কসাই এসে চামড়া তুলে নিয়ে মরা প্রাণিটাকে খোলা জায়গায় অথবা নদীর কিনার ঘেষে ভাসিয়ে দিত। এভাবে সংক্রামক রোগের জীবানু পানির মাধ্যমে আশেপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়তো। প্রকল্পের আওতায় উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রদান কালে খামারীদের এভাবে গবাদি প্রাণি সৎকারের খারাপ দিকগুলো সর্ম্পকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। উদ্যোগের আওতায় গাভী পালনকারী খামারীদের মধ্যে বিভিন্ন সংক্রামক রোগগুলোর তথ্য সম্বলিত সচেতনতামূলক ৮০০০টি লিফলেট, পোষ্টার বিতরন করা হয়েছে, জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বিলবোর্ড বসানো হয়েছে। খামারীদের নিয়ে প্রতি মাসে ইস্যুভিত্তিক সভা আয়োজন করা হয়েছে। এলাকার খামারীদের খামারগুলোতে নিয়মিতভাবে কারিগরি ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে খামারীদের মধ্যে গবাদি প্রাণি সৎকারে ব্যাপক সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খামারীরা এখন গবাদি প্রাণি মারা গেলে গভীর গর্ত করে পুঁতে রাখে এবং

চারপাশে চুন ছিটিয়ে দেয় যাতে কোনভাবে কোন ক্ষতিকর জীবানু মাটির উপরে চলে না আসতে পারে। এর ফলে এলাকায় সংক্রামক রোগের ব্যাপ্তি কমে গেছে যা সামগ্রিক অর্থে পুরো এলাকায় গবাদি প্রাণির মৃত্যুহার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে (বিস্তারিত টেবিল-৬ তে)।

প্রাক মূল্যায়নে দেখা যায় মৃত্যু ২৪১টি গরুর মধ্যে অগভীর গর্ত করে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে-১৫১টি গরু; খোলা জায়গায় ফেলে দিয়েছে-৫৪টি গরু; নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে-১৯টি গরু; গভীর গর্ত করে মাটি চাপা দিয়েছে-১৬টি এবং বিক্রি করেছে-০১টি গরু। প্রকল্প গ্রহণের ফলে প্রকল্প শেষে এ চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। চূড়ান্ত জরিপে দেখা যায় সকর মৃত্যু গরুকে খামারীরা গভীর গর্ত করে (৬ ফুট মাটির নিচে) মাটি চাপা দিয়েছে। মৃত্যু গরুর সঠিক উপায়ে সৎকার করার কারণে প্রকল্প এলাকায় রোগ ব্যাধি ছড়ানোর হার ব্যাপকভাবে কমেছে।

টেবিল-৬ঃ মৃত গরুর অপসারণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	মোট গরুর সংখ্যা	মৃত গরুর সংখ্যা	মৃত গরুর অপসারণে গৃহিত ব্যবস্থা
প্রাক-মূল্যায়ন জরিপ	২,৪০৪ টি	২৪১টি	অগভীর গর্ত করে মাটি চাপা দিয়েছে-১৫১টি; খালি জায়গায় ফেলে দিয়েছে-৫৪টি; নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে-১৯টি; গভীর গর্ত করে মাটি চাপা দিয়েছে- ১৬টি এবং বিক্রয় করেছে-০১টি।
চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ	২,৭৫৮টি	২৯টি	গভীর গর্ত (৬ ফুট মাটির নিচে) করে মাটি চাপা দিয়েছে-২৯টি।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও চিকিৎসা সেবা খামারীদের দোরগোড়ে পৌঁছে এবং সার্বক্ষনিক করার জন্যে প্রকল্প এলাকায় একটি চিকিৎসাকেন্দ্র ও মিনি ভেটেরিনারী ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। যেখান থেকে ভেটেরিনারী ডাক্তারের মাধ্যমে খামারীদের গাভীর গোবর ও মূত্র পরীক্ষা করে ফ্রি ভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে খামারীরা নিজস্ব উদ্যোগে তাদের গাভীর গোবরের নমুনা ল্যাবে নিয়ে আসছে এবং পরীক্ষা করে প্রয়োজনী চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা নিচ্ছে।

প্রকল্প থেকে নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান, মৃত গরুর সঠিকভাবে সৎকার, ল্যাব থেকে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান, ডাক্তারের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক কারিগরি, পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা এবং সার্বিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের মাধ্যমে খামারীদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্থ করার ফলে প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত খামারীদের গাভীর মৃত্যুহার ১.০৫% এ নেমে এসেছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ১০.০২% (বিস্তারিত টেবিল-৭)।

টেবিল-৭ঃ গরুর মৃত্যুহার সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	মোট গরুর সংখ্যা	মোট মৃত গরুর সংখ্যা	মৃত্যুহার হার (%)	গরু মারা যাওয়ার কারণ
প্রাক-মূল্যায়নে	২,৪০৪	২৪১	১০.০২	তড়কা রোগ ১০১টি, ক্ষুরা রোগ ২৩টি, বাদলা ১৬টি, গলাফুলা ২২টি, খাদ্য বিষক্রিয়া ৫টি, রাসায়নিক বিষক্রিয়া ১টি, সিসা বিষক্রিয়া ২টি, কৃমি-৮টি, স্ট্রোক ৩টি, আহত হয়ে মৃত্যুবরণ ২টি, ওলান ফুলা ২টি, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যু ২১টি, পাতলা পায়খানা ৮টি, নাভী পঁচা ২টি, জলাতংক ৪টি, ভ্রূণাবস্থায় মৃত্যু ১৪টি, রক্ত পড়া ১টি, পেট ফাপা ৬টি, **মোট ২৪১টি**
চূড়ান্ত মূল্যায়নে	২,৭৫৮	২৯	১.০৫	তড়কা রোগ ১৫টি, ক্ষুরা রোগ ৫টি, খাদ্য বিষক্রিয়া ২টি, ডায়ারিয়া রোগে ২টি, বাদলা রোগে-১টি, কৃমি রোগে-১টি, পেট ফাপা রোগ ১টি, শ্বাস প্রদাহ রোগে ১টি নাইট্রাইট পয়জনিং রোগে ১টি, **মোট ২৯টি**

ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন

গাভীর মৃত্যু হার হ্রাসের পাশাপাশি প্রকল্প গ্রহণের ফলে গাভী পালনের ব্যবস্থাপনিক যে পরিবর্তন এসেছে তা নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

গাভীর জাত উন্নয়নঃ

প্রকল্পভুক্ত অধিকাংশ খামারী ভালো জাতের গাভী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যের শোনা কথা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে গাভী নির্বাচন করতো অর্থাৎ গাভীর জাত উন্নয়নের জন্যে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ ছিল না। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে খামারীদের গাভীর জাত উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত খামারীরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের আলোকে গাভীর জাত নির্বাচন করছে (বিস্তারিত টেবিল-৮)।

টেবিল-৮ঃ গাভীর জাত নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চূড়ান্ত মূল্যায়নে
অভিজ্ঞতার আলোকে	৫৯৬	০৫
প্রশিক্ষণলবদ্ধ জ্ঞানে আলোকে	০২	৫৯৫
জাত না চিনে	০	০
অন্যের পরামর্শে	০২	০

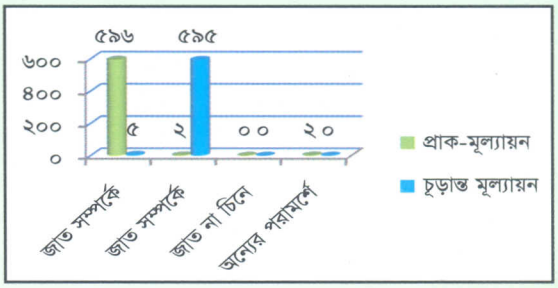

গাভীর জাত নিবাচনের পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রকল্পভুক্ত খামারীদের সচেতনতা বেড়েছে। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারী (৬০০জন) সরকারী পশু হাসপাতাল থেকে কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহন করছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছিল ৫৪৭জন (বিস্তারিত টেবিল-৯)।

টেবিল-৯ঃ কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	সরকারি হাসপাতাল	অন্য সংস্থা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাম্য চিকিৎসক
প্রাক-মূল্যায়নে	৫৪৭ জন	২ জন	৫১ জন
চূড়ান্ত মূল্যায়নে	৬০০ জন	০	০

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনঃ

গাভী হতে অধিক হারে দুধ পেতে হলে খাদ্যের প্রতি যত্নবান হতে হবে। যদি খাদ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা যায় তাহলেই গাভীকে একটি লাভজনক প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী যে সব খাবার গ্রহণ করে বেঁচে থাকে, সে সব খাদ্য মূলত ছয়টি উপাদানে গঠিত। এই ছয়টি পুষ্টি উপাদান সমপরিমানে বিদ্যমান খাদ্যেকে সুষম খাদ্য বলে যা গাভীর শরীর কর্মক্ষম এবং তার উৎপাদনশীলতা সঠিক রাখতে অত্যাবশ্যক।

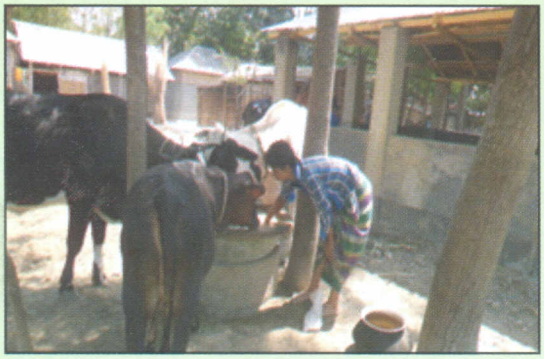

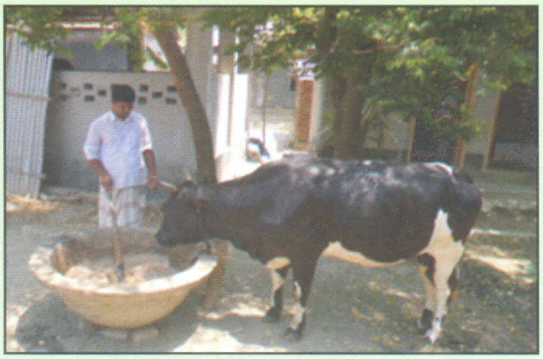

খাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদনের যে কোন একটির অভাব হলে প্রাণী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং তার উৎপাদন কমে যাবে। তাই কেবলমাত্র একজাতীয় খাদ্য খেয়ে শরীরের সব পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ একেক জাতীয় খাদ্যে একেক রকমের পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। গাভীর বয়স ও দুধ উৎপাদন অনুসারে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই গাভীর শরীর ঠিক রাখতে এবং দুধ উৎপাদন সঠিকমাত্রায় রাখতে সুষম খাদ্য তৈরী, দুধ উৎপাদন ও বয়সভেদে তা সরবরাহ এবং এ সংক্রান্ত সঠিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রতিটি গাভী পালনকারী খামারীর থাকা প্রয়োজন। এ বিয়য়টি বিবেচনায় প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কারিগরি, প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হাতে-কলমে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং খামারীদের অভ্যস্থ করা চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারী প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের আলোকে সুষম খাদ্য তৈরী, গাভীর বয়স, ওজন এবং দুধ উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত দানাদার

খাদ্য, শুষ্ক খাদ্য এবং কাঁচা ঘাস সরবরাহ করছে। প্রকল্পভুক্ত ৬০০ জন খামারীর মধ্যে বর্তমানে ৫৪০জন খামারী বর্তমানে নিজেরাই সুষম খাদ্য তৈরি করে গাভীর দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে নিয়মিতভাবে গাভীকে খাওয়াচ্ছে (টেবিল-১০)।

টেবিল-১০ঃ দানাদার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে
খাদ্যের গুনগতমান বিবেচনা করে খাদ্য প্রদান	২০৯	৫৪০
অনুমান করে দানাদার খাদ্য প্রদান করতো	৩৯১	৬০

খাদ্য ব্যবস্থাপানায় আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে প্রকল্পভুক্ত অধিকাংশ খামারী বর্তমানে উন্নত জাতের কাঁচা ঘাসের চাষ করছে। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার জন্যে নিয়মিত কাঁচা ঘাস সরবরাহের কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশের তথা প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ খামারীরা গাভীকে কাঁচা ঘাস সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত কাঁচা ঘাসের উপর নির্ভরশীল কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে সারা বছর সমভাবে প্রকৃতিতে কাঁচাঘাসের উৎপাদন থাকে না বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে। ফলে খামারীরা সারা বছর সক্ষমভাবে গাভীকে কাঁচা ঘাস দিতে পারে না বলে তারা গাভী থেকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দুধ পায় না যা বাংলাদেশ তথা প্রকল্প এলাকার খামারীদের গাভী পালনের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। এ সমস্যা থেকে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের বের করে আনার জন্যে তাদেরকে উন্নত জাতের কাঁচা ঘাস চাষের উদ্বুদ্ধ করতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং চাষ পদ্ধতি হাতে কলমে শিখানো হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত অধিকাংশ খামারী উন্নত জাতের কাঁচা ঘাসের চাষ করে গাভীকে নিয়মিত কাঁচা ঘাস খাওয়াচ্ছে যা বেশি দুধ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে (টেবিল-১১)।

টেবিল-১১ঃ উন্নত জাতের কাঁচা ঘাস চাষ সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	কাঁচা ঘাস চাষ করেন খাওয়ান (জন)	কাঁচা ঘাসের চাষ করেন না (জন)
প্রাক-মূল্যায়নে	৪৮১	১১৯
চূড়ান্ত মূল্যায়নে	৪৯৪	১০৬

বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনঃ

গাভী পালনের আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনা বলতে গোয়ালঘরটিতে পর্যাপ্ত আলো-বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকবে, গাভী দাঁড়ানোর মত প্রয়োজনীয় জায়গা থাকবে, ঠান্ডা, উষ্ণ এবং প্রতিকূল আবহাওয়া ও ক্ষতিকর প্রাণী থেকে গাভীকে রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে, সহজে খাদ্য প্রদান, দুধ গ্রহণ এবং গোবর মূত্র নির্গমন ও নিষ্কাশনে ব্যবস্থা থাকবে এমন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গোয়ালঘরকে বুঝায়। এ সকল ব্যবস্থা না থাকলে গাভী রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়

বেশি এবং দুধ উৎপাদনও কম হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রকল্পের শুরুতে বেশির ভাগ খামারীর স্বচ্ছ ধারণা ও জ্ঞান ছিল না। প্রকল্পের আওতায় খামারীদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সারা বছর ধরে প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারদের মাধ্যমে কারিগরি, প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে নানাবিদ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রকল্পভুক্ত অধিকাংশ খামারী নিয়মিত গোয়ালঘর পরিষ্কার, চাড়ি পরিষ্কার, গোবর পরিষ্কার করে পাশে গর্ত করে পুতে রাখা, গোয়ালঘরে আলো-বাতাস চলাচলে ব্যবস্থা রাখা, মেঝে শুষ্ক রাখা, ফোর ম্যাট ব্যবহার সহ আদর্শ গোয়ালঘর ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে গাভী পালন করছে যা গাভীকে রোগ মুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গাভীর বাসস্থান ও আলো বাতাস চলাচল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যঃ গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনার প্রাপ্ত চূড়ান্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, যথেষ্ট আয়তন আছে এমন খামারের সংখ্যা প্রকল্প এলাকায় ৫৬৮টি (৯৫%) এবং আয়তন যথেষ্ট নেই এরূপ খামারের সংখ্যা ৩২টি (৫%), ৫৮৫ টি খামারে (৯৮%) পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা আছে এবং বাকি ১৫টি (২.৫%) খামারে আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা নেই। চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপের তথ্য থেকে জানা যায়, দুধ দিচ্ছে এরূপ দেশি জাতের গাভী পালন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং উন্নত জাতের গাভী পালন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দুধ দিচ্ছে না এরূপ দেশি জাতের গাভী পালন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং দুধ দিচ্ছে না এরূপ উন্নত জাতের গাভী পালন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য দেশি গরু/বাছুরের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যান্য উন্নত জাতের গরু/বাছুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে (টেবিল-১২)।

টেবিল-১২ঃ গাভীর বাসস্থান ও আলো বাতাস চলাচল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	গরুর সংখ্যা অনুযায়ী বাসস্থানের আয়তন		বাসস্থানে আলো বাতাসের ব্যবস্থা	
	যথেষ্ট	যথেষ্ট না	যথেষ্ট	যথেষ্ট না
প্রাক-মূল্যায়ন	১৭১	৪২৯	২৭৬	৩২৪
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৫৬৮	৩২	৫৮৫	১৫

গাভী থাকার জায়গা ও গাভীর ঘর ও চাড়ি পরিষ্কার সংক্রান্ত তথ্যঃ চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ থেকে জানা যায়, গাভী থাকার আরামদায়ক জায়গা পাওয়া যায় ৫৬৭টি (৯৫%) খামারে যা প্রাক জরিপে ছিল ২৭৬ টি খামারে। অন্যদিকে প্রাক জরিপে গাভী থাকার জায়গা আরামদায়ক নয় এমন খামার পাওয়া যায় ৩২৪টি যা চুড়ান্ত জরিপে কমে এসেছে ৩৩টিতে। চূড়ান্ত মূল্যায়নে দেখা যায়, নিয়মিত গরুর ঘর ও চাড়ি পরিষ্কার করছে ৫৮৯ জন খামারী এবং অনিয়মিত ১১টি যা প্রাক মূল্যায়নে ছিল যথাক্রমে ৫৬১ জন এবং ৩৯জন (বিস্তারিত টেবিল-১৩)।

টেবিল-১৩ঃ গাভী থাকার জায়গা ও গাভীর ঘর ও চাড়ি পরিষ্কার সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	গরুর থাকার জায়গা		গরুর ঘর ও চাড়ি পরিষ্কার	
	আরামদায়ক	আরামদায়ক না	নিয়মিত	অনিয়মিত
প্রাক-মূল্যায়ন	২৭৬টি	৩২৪টি	৫৬১জন	৩৯জন
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৫৬৭টি	৩৩টি	৫৮৯জন	১১জন

গাভীর বাসস্থান জীবাণুমুক্তকরণ ও গোয়াল ঘরের ধরণঃ চূড়ান্ত জরিপ থেকে জানা যায়, প্রকল্পভূক্ত খামারগুলোতে সপ্তাহে একবার জীবাণুনাশক প্রয়োগ করা হয় ২২২টি (৩৭%) খামারে, অনিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করা হয় ৩৭৩ টি (৬২%) খামারে এবং জীবাণুনাশক প্রয়োগ করা হয় না ৫টি (১%) খামারে। গোয়াল ঘরের ধরণ থেকে পাওয়া যায় ৫১টি (৮.৫০%) পাকা ঘর, ৫৪৯টি (৯১.৫০%) টিনশেড ঘর ও কোন খড়ের ঘর পাওয়া যায়নি (টেবিল-১৪)।

টেবিল-১৪ঃ গাভীর বাসস্থান জীবাণুমুক্তকরণ ও গোয়াল ঘরের ধরণ সর্ম্পকিত তথ্য

বিবরণ	বাসস্থান জীবাণুমুক্তকরণ তথ্য			গোয়াল ঘরের ধরণ		
	এক বার	অনিয়মিত	করা হয় না	পাকা	টিনশেড	খড়ের ঘর
প্রাক-মূল্যায়ন	৭	২৮	৫৬৫	১৯	৫৭২	৯
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	২২২	৩৭৩	৫	৫১	৫৪৯	০

ছক-৬ এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন থেকে জানা যায়, পূর্বের তুলনায় সপ্তাহে ১ বার ঘর জীবাণুমুক্ত করা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্বের তুলনায় অনিয়মিত ঘর জীবাণুমুক্ত করা বৃদ্ধি পেয়েছে সপ্তাহে ঘর জীবাণুমুক্ত করা হয় না পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। পাকা গোয়াল ঘর বৃদ্ধি পেয়েছে ও টিনশেড গোয়াল ঘর হ্রাস পেয়েছে।

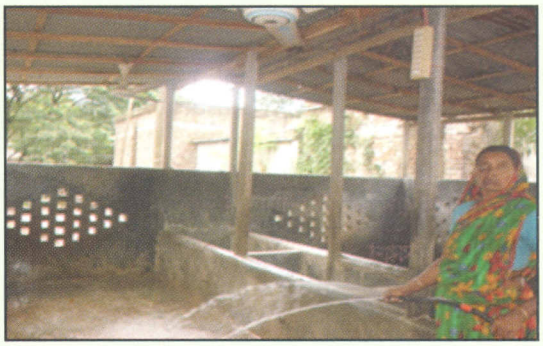

গোয়াল ঘরের মেঝের ধরণ ও বাসস্থানের নর্দমা ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প এলাকায় ৬০০টি গোয়াল ঘরের মধ্যে মেঝে কাঁচা ঘর ১৯ টি (৩%) খামার, মেঝেতে ইটের সলিং ৫৮১টি (৯৭%) খামার। বাসস্থানে নর্দমার ব্যবস্থার তথ্য থেকে পাওয়া যায় উপযুক্ত বাসস্থান ৫৩৫টি (৮৯.১৭%) উপযুক্ত না এমন খামারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

টেবিল-১৫ঃ গোয়াল ঘরের মেঝের ধরণ ও বাসস্থানের নর্দমা ব্যবস্থাপনা

বিবরণ	গোয়াল ঘরের মেঝের ধরণ		বাসস্থানে নর্দমার ব্যবস্থা	
	কাঁচা	ইটের সলিং	উপযুক্ত	উপযুক্ত না
প্রাক-মূল্যায়ন	৩৫	৫৬৫	১৬২	৪৩৮
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	১৯	৫৮১	৫৩৫	৬৫

চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ থেকে জানা যায়, কাঁচা গোয়াল ঘরের মেঝে কাঁচা ঘর হ্রাস পেয়েছে, মেঝেতে ইটের সলিং বৃদ্ধি পেয়েছে। নর্দমা ব্যবস্থা উপযুক্ত এমন খামারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খামার উপযুক্ত নয় এমন খামার হ্রাস পেয়েছে।

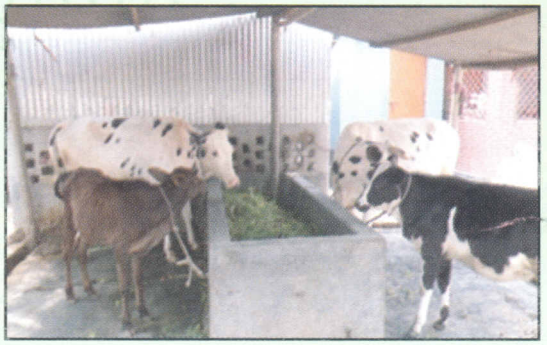

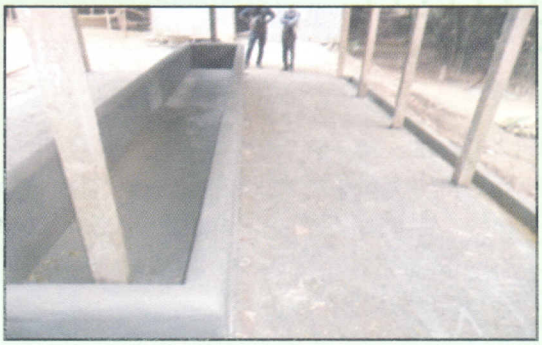

খামারে জীবাণুনাশক ব্যবহারঃ চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ থেকে পাওয়া যায় গাভী পালনকারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে জীবাণুনাশক হিসেবে পটাশ ব্যবহার করে ২৩ জন খামারী (৪%), ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে ৫৭৭ জন খামারী (৯৬%)। যা ছক-৮ এ প্রদর্শিত হলো। ছক-৮ থেকে দেখা যায়, চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ অনুযায়ী ৬০০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ২৩ জন উদ্যোক্তা গাভীর ঘর জীবাণুনাশক হিসেবে পটাশ ব্যবহার করেন কিন্তু পূর্বে কেউই পটাশ ব্যবহার করতেন না এবং বাকী ৫৭৭ জন উদ্যোক্তা ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করেন। এতে দেখা যায় ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারকারী পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (টেবিল-১৬)।

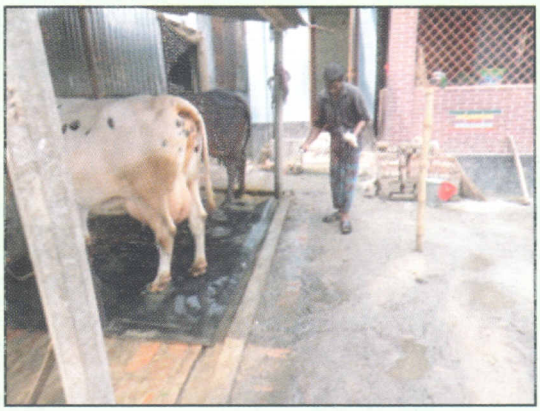

টেবিল-১৬ঃ খামারে জীবাণুনাশক ব্যবহার

বিবরণ	গোয়াল ঘরে জীবানুনাশক ব্যবহার			
	পটাশ	ব্লিচিং পাউডার	ফিনাইল	ব্যবহার করা হয়না
প্রাক-মূল্যায়ন	০	১১	৫	৫৮৪
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	২৩	৫৭৭	০	০

গবাদি প্রাণির গোবর ব্যবস্থাপনাঃ চুড়ান্ত জরিপ অনুযায়ী গোবর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শেডে সংরক্ষণ করেন ৫৮২ জন খামারী (৯৭%) এবং খোলা জায়গায় রেখে দেন ১৮ জন খামারী (৩%) যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছিল যথাক্রমে ০৭ জন এবং ৫৯৩জন (টেবিল-১৭)।

টেবিল-১৭ঃ খামারে জীবাণুনাশক ব্যবহার

বিবরণ	শেডে	খোলা জায়গায়
প্রাক মূল্যায়ন	৭	৫৯৩
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৫৮২	১৮

উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি

উন্নত জাতের গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কর্মকাণ্ড সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের মোট গরুর সংখ্যা এবং দুধ উৎপাদন উন্নত জাতের গাভীর সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক অবস্থায় প্রকল্পভুক্ত ৬০০ জন খামারীর মোট গরু ছিল ২৪০৪টি যা প্রকল্প শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৫৮ টি অর্থাৎ মোট গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৭২%। মোট গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নতজাতের গাভীর সংখ্যাও ৩৫.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে (বিস্তারিত টেবিল-১৮)।

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে (সংখ্যা)	চূড়ান্ত মূল্যায়নে (সংখ্যা)	বৃদ্ধি (%)
গাভী সংখ্যা	৭৭০টি	১০৪২টি	৩৫.৩২
মোট গরু সংখ্যা	২৪০৪টি	২৭৫৮টি	১৪.৭২

গাভীর দুধ উৎপাদনের সময়কাল বৃদ্ধিঃ

দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গাভীর দুধ উৎপাদনকাল (Lactation period) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা যে গাভীর দুধ উৎপাদনকাল যত বেশি সে গাভী বেশি দুধ দেয় অর্থাৎ বেশি দিন ধরে দুধ দিতে পারে। গাভীর দুধ উৎপাদনকাল অনেকটা গাভীর জাত নির্বাচন, উন্নতমানের খাদ্য, বাসস্থান এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উপর নির্ভর করে থাকে। সঠিক ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন, গাভীকে নিয়মিত পুষ্টিকর দানাদার খাদ্য ও কাঁচা ঘাস প্রদান, সময়মত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান এবং রোগ বালাই দমন করার মাধ্যমে দুধ উৎপাদনকাল কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্ণিত বিবেচনায় প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে গাভীর দুধ দেয়ার সময়কাল গাভীর ক্ষেত্রে ১২ দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাক জরিপে দেখা যায় দুধ দেয়ার সময়কাল গড়ে ২১৫দিন ছিল যা প্রকল্প শেষে ২২৭ দিনে উন্নিত হয়েছে (বিস্তারিত টেবিল-১৯)।

টেবিল-১৯ঃ গাভীর দুধ উৎপাদনের সময়কাল বৃদ্ধি

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চূড়ান্ত মূল্যায়নে
ল্যাকটেশন পিরিয়ড	২১৫ দিন	২২৭ দিন

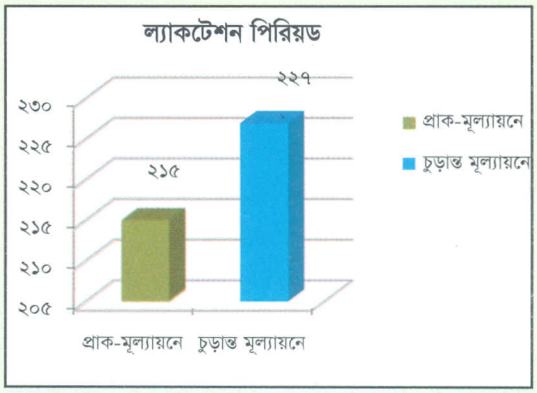

দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গাভী পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন করা। অধিক দুধ উৎপাদনের জন্যে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের মাধ্যমে প্রকল্প আওতায় নানাবিধ কর্মকাণ্ড যেমন: খামারীদের আদর্শ গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন, উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহের মাধ্যমে উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন, ব্যসস্থান ব্যবস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, রোগ বালাই দমনের জন্যে গাভীকে নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়।

সফলভাবে বর্ণিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের দুধালো গাভীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গাভীর সংখ্যার পাশাপাশি গাভীর দুধ উৎপাদনকালও গড়ে ১২দিন করে বেড়েছে যা সার্বিকভাবে গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন সহ মোট দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকল্পের শুরুতে মোট দুধেল গাভীর সংখ্যা ছিল ৭৭০ টি যা প্রকল্প শেষে দাঁড়িয়েছে ১০৪২ টিতে। প্রকল্প শুরুতে গড়ে গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭.৯০ লিটার এবং দৈনিক মোট দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬০৮৩ লিটার। প্রকল্প শেষে গড়ে গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদনের বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৯৮ লিটার এবং দৈনিক মোট দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৩৫৭.১৬লিটার। গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন বেড়েছে ১.০৮ লিটার (বিস্তারিত টেবিল-২০ তে)।

টেবিল-২০ঃ দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে	বৃদ্ধি
মোট গাভী সংখ্যা	৭৭০টি	১০৪২টি	৩৫.৩২%
গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন ছিল	৭.৯০লি.	৮.৯৮লি.	গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন বেড়েছে ১.০৮ লিটার
মোট দৈনিক দুধ উৎপাদন	৬০৮৩লি.	৯৩৫৭.১৬লি.	৫৩.৮২%

উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল গাভী পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন করে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে। সফলভাবে প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে

একটি উন্নতজাতের গাভী পালন করে দুধ বিক্রির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বাৎসরিক আয় পূর্বের তুলনায় ৬০.০৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে খাদ্য ও চিকিৎসা খরচ ধরা হয়েছে এবং আয়ের ক্ষেত্রে দুধ, বাছুর এবং গোবর বিক্রি হতে আয় ধরা হয়েছে। (বিস্তারিত টেবিল-২১)।

টেবিল-২১ঃ উন্নত জাতের ১টি গাভী পালন থেকে বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়	ব্যয় (টাকা)	আয় (টাকা)	নিট আয়
প্রাক-মূল্যায়নে	৬৬,০০০	১,০১ ,৯৪০	৩৫,৯৪০
চুড়ান্ত মূল্যায়নে	৫৪,০১৯	১,১১,৫৩৮	৫৭,৫১৯

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সমস্ত গরুসহ সকল ধরণের গবাদিপশুর চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের জন্যে প্রকল্প এলাকায় ০৩জন গবাদিপশুর ঔষধ বিক্রেতা তৈরী বা ভেটেরিনারি ফার্মেসী স্থাপিত হয়েছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছিল না। ১০জন এলএসপি তৈরী হয়েছে। প্রকল্পের প্রভাবে নতুন করে অনেক খামারী ভালো জাতের গাভী ক্রয় করেছে, অনেকে খামার বড় আকারের করেছে এবং উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

১. গাভীর মৃত্যুহার কমিয়ে রোগমুক্ত উন্নত জাতের গাভী পালন এবং দুধ উৎপাদনের জন্য নিয়মিত টিকা এবং কৃত্রিম প্রজননের জন্য উন্নতমানের সীমেন প্রয়োজন। সময়মত টিকা ও ভালোমানের সীমেন প্রাপ্তি খামারীদের জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ।

২. উন্নত জাতের গাভী পালনের ক্ষেত্রে মোট খরচের শতকরা ৭০ ভাগই খাদ্যের জন্য ব্যয় হয়। এই ৭০ভাগ খরচের বেশির ভাগ ব্যয় গাভীর জন্যে দানাদার খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় হয়ে থাকে। আর এই দানাদার খাদ্যের দাম দিন দিন বেড়েই চলছে। যা উন্নত জাতের গাভী পালনে ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা।

সুপারিশ

১. স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে খামারীদের একটি শক্তিশালী লিংকেজ তৈরীর মাধ্যমে গুনগতমান সম্পন্ন উন্নত জাতের ষাড়ের সীমেন, সময়মত টিকা ও কৃমিনাশক প্রাপ্তি এবং প্রদান সহ চিকিৎসা সেবা সময়মত খামারীদের কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব।

২. দানাদার খাদ্যের জন্যে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদন দিয়ে প্রকল্পের খামারীদের নিয়ে ছোট আকারে সুষম রেডি ফিডের মিল করা যেতে পারে। যেখান থেকে "No Loss No Profit" ভিত্তিতে রেডি ফিড তৈরী করে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া খাদ্যের দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুধের মূল্য নির্ধারণ এবং খামারীদের সেই মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. এলাকা ভিত্তিক লাইস্টক প্রোভাইডার তৈরী, তাদেরকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করা বিশেষ করে কৃত্রিম প্রজনন ও টিকা প্রদান বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা এবং এলাকাভিত্তিক মিনি ল্যাব স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ভেটেরিনারী চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গাভীর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ঠিক রাখা যেতে পারে।

সংযুক্তি-১

গরুর ভ্যাকসিনেশন সিডিউল

টিকার নাম	রোগের নাম	প্রথম প্রয়োগ	প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগ স্থান	বোস্টার ডোজ	সংরক্ষণ তাপমাত্রা	সংরক্ষণের মেয়াদ
খুরারোগের টিকা	খুরারোগ (FMD)	৪ মাস বয়স	৯ মিলি	চামড়ার নিচে	৪ মাস	৪-৮° C	৩-৬ মাস
তড়কা টিকা	তড়কা (Anthrax)	৬ মাস বয়স	১ মিলি	চামড়ার নিচে	১ বছর	৪-৮° C	৬ মাস
বাদলা টিকা	বাদলা রোগ (BQ)	৬ মাস বয়স	৫ মিলি	চামড়ার নিচে	৬মাস	৪-৮° C	৬ মাস
গলাফুলা টিকা	গলাফুলা রোগ (HS)	৬ মাস বয়স	২ মিলি	চামড়ার নিচে	১ বছর	৪-৮° C	৬ মাস
জলাতংক টিকা	জলাতংক রোগ (Rabis)	৩ মাস বয়স	৩ মিলি	মাংসে	১ বছর	-২০° C	১ বছর

গরুর কৃমিনাশক খাওয়ানোর সিডিউল

গরু	বয়স	ঔষধের নাম	ঔষধের মাত্রা	পুনরায় ঔষধ প্রয়োগের সময়	ঔষধ প্রয়োগের পদ্ধতি
বাছুর	১-৬ মাস পর্যন্ত	পাইপারভেট/রেনাপার/ এভিপার/পেরাভেট	২০-২৫ গ্রাম প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	৩ মাস পরপর	খাবার/পানির সাথে
বাড়ন্ত গরু	৬ মাস-২ বছর	রেনাডেক্স/এনডেক্স/ এলটিভেট/এন্টিওর্ম/ ট্রাইলেভ-ভেট/লেভেক্স /ট্রিমিসল/লেজল	১/২- ১টি ট্যাবলেট প্রতি ৪০-৮০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	৩-৪ মাস পরপর (উচু অঞ্চলে বছরে ৩ বার এবং নীচু অঞ্চলে বছরে ৪ বার	খাবারের সাথে
গাভী/ ষাড়	২ বছরের উর্দ্ধে	রেনাডেক্স/এনডেক্স/ এলটিভেট/এন্টিওর্ম/ ট্রাইলেভ-ভেট/লেভেক্স /ট্রিমিসল/লেজল	১টি ট্যাবলেট প্রতি ৫০-৭৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	৩-৪ মাস পরপর (উচু অঞ্চলে বছরে ৩ বার এবং নীচু অঞ্চলে বছরে ৪ বার	খাবারের সাথে
গর্ভবতী গাভী	গর্ভধারণের ৩ মাস পর	রেনাডেক্স/এনডেক্স/ এলটিভেট/এন্টিওর্ম/ ট্রাইলেভ-ভেট/লেভেক্স /ট্রিমিসল/লেজল/ নাইট্রোনেক্স	১টি ট্যাবলেট প্রতি ৫০-৭৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	৪ মাস পরপর	খাবারের সাথে, নাইট্রোনেক্স চামড়ার নীচে ইনজেকশন দিতে হবে।

প্রকল্প পরিদর্শন

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন করেন। এছাড়াও পিকেএসএফ এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন। সংস্থার ও পিকেএসএফ কর্মকর্তা ছাড়াও বিদেশি অনেক পরিদর্শনকারী দল বিভিন্ন সময়ে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। নিকটস্থ সরকারি উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন।

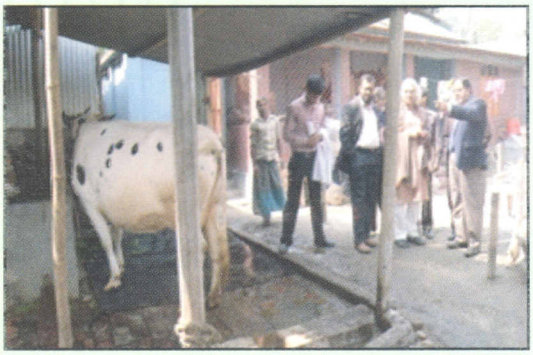

পিকেএসএফ এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং ডাঃ এইচ এম সিদ্দিকি, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

পিকেএসএফ এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান মিনি ভেটেরিনারি ল্যাবের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

ইফাদ কর্তৃক পরিদর্শন

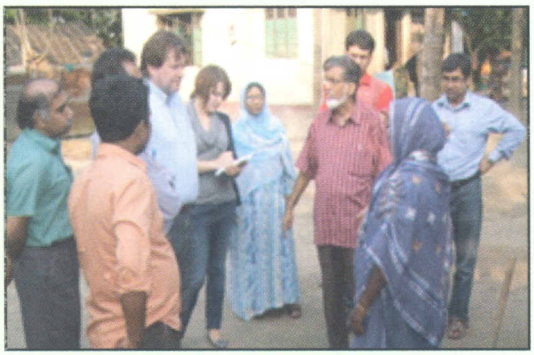

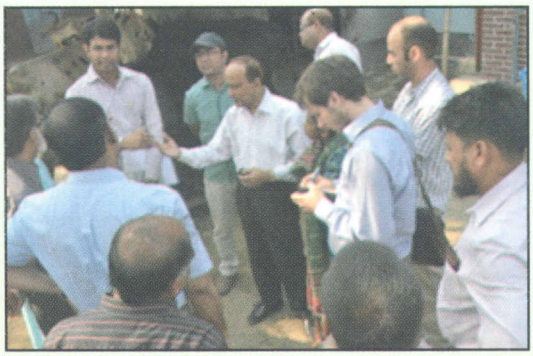

সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)

৭৬/এ, উত্তরপাড়া, সাভার, ঢাকা।

প্রধান কার্যালয়ঃ মুশুরীখোলা, ভার্কুতা, সাভার, ঢাকা।

ফোন ঃ ৮৮-০২-৭৭৪৬২২৯, ৭৭৪৮২৯৩৩

মোবাইল ঃ ০১৭১৫-০২২৬৭৩, ০১৭১৫-৩১৫০২৬,০১৭১১-৮৫৬১২৩

ই-মেইল ঃ sus@citechco.net, info@susbangladesh.org

ওয়েব ঃ www.susbangladesh.org